মনে মনে

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড
৮৯ হ্যারিসন রোড কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৬১

দ্বিতীয় প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৬২

প্রকাশক

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

২৯, হ্যারিসন রোড কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিভা আর্ট প্রেস

১১৫।এ, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-

প্রচ্ছদ

সমীর সরকার

ব্লক

টাওয়ার হাফটোন কোং

মুদ্রণ

নিউ প্রাইমা প্রেস

বাঁধাই

স্বস্তিকা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

দাম দু'টাকা

উৎসর্গ

অকৃত্রিম স্নেহে যিনি আমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের
সমস্ত সুযোগ দিলেন—যাঁর কাছে আমার
অপরিশোধনীয় ঋণ
বর্ত্তমান বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পপতি
শ্রীদেবেন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রদ্ধাস্পদেষু

মোহন বাগান লেন,
কলিকাতা-৪

এই লেখকের অন্যান্য বই

অন্য নগর	(২য় সংস্করণ)
এই মর্ত্যভূমি	(”)
দূরের মিছিল	(”)
মুখর লণ্ডন	(”)
ছায়া মারীচ	(”)
নতুন বাসর	
ইভনিং ইন প্যারিস	
জন সম্রাট	
ব্যালেরিনা	(যন্ত্রস্থ)
বিপাশা	(”)

কর্ণ-কুন্তী

হয়তো সত্যি, হয়তো মিথ্যা, হয়তো প্রতিমাকে আমি —না, সেকথা কিছুই বলবো না !

কতবার কতরকম করে কত লোককে আমি এ কাহিনী বলেছি ! কিন্তু আর নয়, এই আমার শেষ বলা, তড়িৎ তুমিই আমার শেষ শ্রোতা !

বারে বারে চঞ্চল সমুদ্র রাত্রিদিন আমাকে ডাকে। মনের নিভৃততম কোণ থেকে কে যেন ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে কেঁদে ওঠে। প্রতিমা, তুমি কোথায় ! তোমার প্রাণের নির্জন গহনে রেখে এলাম আমার কম্পিত স্বাক্ষর।

আজ আকাশে-বাতাসে শুধু শুনি ঘর-ভাঙার গান। ছেড়ে যাওয়ার নেশায় উন্মাদ হয়ে তুচ্ছ সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ঘুণ-ধরা বাঁধন চূর্ণ করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি। জীবনের কোথায় যেন তার কেটে গেছে, কোথায় যেন কাঁটা লেগে আছে, শুধু হাহাকার বাজে—শিশু-কণ্ঠের দিগন্ত-দীর্ণ হাহাকার ! চার-পাশে শুধু ঘরভাঙার গান—শুধু সমুদ্র-গর্জন। আজ ভাবি, ফেলে আসা, না ঠেলে আসা, রেখে আসা, না সরে আসা, বিরহ না পলায়ন !

আজও মাঝে মাঝে দোলা লাগে, আর থেকে থেকে কানে বাজে জাহাজের বাঁশী। সে-বিরাট ভাসমান নগরী দুলে দুলে উঠছে। স্ফীত ক্রুদ্ধ অজগরের মতো চারপাশে শুধু একটানা সমুদ্র-গর্জন আর জলের উপর গম্ভীর ঘন অন্ধকার!

মনে করো তড়িৎ, সেই জাহাজে তুমি দেশে ফিরছো, হাঁ। ধরে নাও এই তিন বছর তুমি বিলেতে ছিলে। কাল সকালে জাহাজ বম্বে বন্দরে পৌঁছবে। অনেক দিন পর তুমি ফিরছো, তাই আজ রাত্রে একটা মধুর উত্তেজনায় তোমার শরীরে শিহরণ লাগা খুবই স্বাভাবিক!

কাল সকালে বম্বে। আজই জাহাজে তোমার শেষ রাত! ঘুম আসা কঠিন। কিছুতেই যখন ঘুম এলো না, তখন মনে করো আস্তে আস্তে তুমি 'ডেকে' চলে এলে আর চারপাশে তাকিয়ে মনে হলো, রাত অনেক!

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তুমি দিশেহারা হয়ে গেলে। জাহাজের স্তিমিত আলোয় শাণিত ইস্পাতের মতো ঝলসে ঝলসে উঠছে উজ্জ্বল রূপালী ঢেউ!

ওপরে নক্ষত্রবহুল বিশাল আকাশ, সামনে ফেনিল উন্মুক্ত জলরাশি। সেই রাত্রে তোমার চোখে ঘুম নেই, অনেক দিন পর তুমি ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার স্বাধীন ভারতের বুকে। সমুদ্র-গর্জনের তালে তালে তোমার চারপাশে শুধু একটি পদ নিরন্তর গুঞ্জন করে ফিরছে, "তোমায় পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি- "

না, না, তড়িৎ তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো না। এমন ক'রে আর আমাকে বাধা দিও না, আমাকে শুধু বলে যেতে দাও! আমি জানি না সে কোথায়। কিন্তু কে যেন ডাকে, আমাকে কেবলই ডাকে! ঝড়, সমুদ্র, অরণ্য-পর্বত আমাকে বারে বারে ডাকে!

ভেঙে যাক্ ঘর, প'ড়ে থাক্ সংসার! সমুদ্র, তুমি আমাকে মুক্তি দাও! আমার নিঃসীম শূন্যতা, আমার ব্যর্থতার জ্বালাময় ক্রন্দন, আমার বুক-জোড়া হাহাকার ভ'রে তোলো তোমার রূপে, রঙে, গর্জনে—আমাকে নিয়ে চলো তোমার কলোচ্ছ্বাসের মাঝে!

কিন্তু অবশেষে এমনি করেই কি মুক্তি এলো! শুধু হারানো দিনের অনুরণন, শুধু ছলো ছলো মুখ, শুধু পেয়ে-হারানোর মন্থর প্রহরের মৃদু কম্পন! মুক্তির মাঝে এমনি ক'রে পরানো মায়ার কঙ্কণঝঙ্কার বাজে কেন! পারহীন সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাসে এ কী করুণ পরিহাস! প্রতিমা, তুমি কোথায়!

তুমি অমন অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছো? আরে ছি, ছি, কি ব'কে গেলাম এতক্ষণ! মিথ্যা, মিথ্যা! আমার প্রলাপ ক্ষমা ক'রো তড়িৎ! বয়স হয়েছে, কি না, তাই মাথার ঠিক নেই।

কোথায় থেমেছিলাম বল তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তুমি একা শেষ রাত্রে 'ডেকে' দাঁড়িয়ে—

হঠাৎ 'ডেকে'র একেবারে অন্য প্রান্তে তুমি তাকিয়ে দেখলে ডেক-চেয়ারে কে যেন শুয়ে আছে আর তার কোলে ছোট ছেলেকে দেখে তোমার বুঝতে দেরী হলো না যে সে প্রতিমা। হ্যাঁ, এই জাহাজে সে-ও দেশে ফিরছে!

প্রতিমার সঙ্গে এর মধ্যে তোমার আলাপ হয়েছে বৈকি! এই সমুদ্র-পথেই তার সঙ্গে তোমার অনেক কথা-বার্তা হয়েছে! আর যদি তুমি তোমার মনের মধ্যে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখো তা'হলে—না, সেকথা থাক তড়িৎ!

প্রতিমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তুমি এইটুকু জেনেছ যে, সে বিলেতে সাংবাদিকের কাজ শিখতে এসেছিল—বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে সে। আর জেনেছ তার একটি খুব ছোট ছেলে আছে কিন্তু স্বামী নেই। লণ্ডনে প্রবীরের সঙ্গে তার প্রেম হয় আর লণ্ডনেই দুর্ঘটনায় প্রবীর হঠাৎ মারা যায়। আরও একটি কথা তুমি জানো, প্রতিমার প্রেম অথবা তার এই শিশু-সন্তানের কথা তার মা-বাবা এখনও জানেন না!

চলো এবার তড়িৎ, 'ডেকে'র অন্য প্রান্তে এগিয়ে চলো, প্রতিমার সঙ্গে কথা বলা যাক। না, তোমাকে বলতে হলো না, সেই-ই আগে কথা বললো –

এখনও জেগে আছেন যে?

কিছুতেই ঘুম আসছে না।

হেসে প্রতিমা বললো, খুবই স্বাভাবিক, চেয়ারটা টেনে এনে বসুন, গল্প করা যাক!

হ্যাঁ সেই ভালো, চেয়ার টেনে প্রতিমার পাশে তুমি বসে পড়লে, বললে, এত রাত্রে খোকাকে বাইরে রেখেছেন কেন? ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে—

কোথায় ঠাণ্ডা, যা গরম!

তারপর কিছুক্ষণ আর কোন কথা হলো না। চারপাশ থেকে তোমার কানে এসে বাজছে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের দুরন্ত গর্জন। তোমাকে ঘিরে রয়েছে চঞ্চল কালো জল। আর সেই শেষ রাত্রে জাহাজের স্তিমিত আলোয় তুমি শুধু প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছো। আর তোমার মনের কোন কোণে হয়তো ক্ষণে ক্ষণে অকারণে বেদনা বাজছে!

হঠাৎ তুমি প্রতিমাকে প্রশ্ন করলে, আপনার বিয়ের কথা তো আপনার মা-বাবা এখনও জানেন না, না?

বিয়ে? হঠাৎ যেন প্রতিমা চমকে উঠলো, বিয়ে তো আমার হয়নি তড়িৎবাবু!

বিক্ষুব্ধ জলরাশির উন্মত্ত গর্জন যেন তোমাকে এখুনি শুষ্ক তৃণখণ্ডের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বারে বারে জাহাজের বাঁশী বাজছে। বল্গাবিহীন বাতাসের দুরন্ত গতিবেগ হয়তো এই ভাসমান অট্টালিকা চূর্ণ ভগ্ন দীর্ণ হয়ে যাবে। তোমার রক্ত সমুদ্রের মতোই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তবু তুমি যেন বেঁচে গেলে তড়িৎ!

প্রতিমার আরও কাছে সরে এসে বললে, কি বলছেন আপনি!

মৃদু হেসে প্রতিমা বললো, আপনাকে বলতে পেরে অনেক হাল্কা বোধ করছি। প্রবীরের সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক আগেই টিউব-য়্যাক্সিডেন্টে সে মারা যায় !

কিন্তু খোকা ? প্রশ্ন করেই তুমি তোমার ভুল বুঝতে-পারলে, তাই আবার তাড়াতাড়ি বলে উঠলে, না না, মানে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

না বোঝবার তো কিছু নেই তড়িৎবাবু, সোজা কথা। কিন্তু আমি কঠিন, হ্যাঁ, খোকাকে আমি বাঁচাবো। আমার কোন ভয় নেই, কোন লজ্জা নেই, এতটুকু সঙ্কোচ নেই।

লজ্জা ভয় সঙ্কোচ ত্যাগ করলেই সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ সুগম হয় না প্রতিমা, হয় আরও দুর্গম—

জানি। আর এও জানি আজ প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার ক্ষমতা আমার আছে !

কিন্তু কি নিয়ে সংগ্রাম সে কথা ভুলে যাবেন না, ভুলে যাবেন না এ সংগ্রামে আপনার নিশ্চিত পরাজয় !

না না না, আমি খাঁটি, কোন অন্যায় আমি করিনি !

ন্যায়-অন্যায়ের কথা নয় —

তবে কিসের কথা ?

আপনার আত্মীয়-স্বজন, আপনার সুনাম-দুর্নাম আপনার চারপাশের আর পাঁচজনের কথা ?

আমার শক্তি আছে, আমার সাহস আছে, আমার মেরুদণ্ডে জোর আছে !

কিন্তু কতদিন ?

চিরদিন, চিরকাল !

না, কিছুতেই চারপাশে মাথা উঁচু করে আপহি চলাফেরা করতে পারবেন না।

সংস্কারে গড়া জাতের মতোই আপনি কথা বলেছেন বটে, কিন্তু জেনে রাখুন, সমস্ত বাধা আমি এক হাতে ঠেলে দেবো। আজ তুচ্ছ সংস্কার আমার কেটে গেছে, কূপমণ্ডুকত্ব ঘুচে গেছে ! সামাজিক অনুষ্ঠান না মেনে যদি কারো জন্ম হয় সে-ও মানুষ, বাঁচবার পূর্ণ অধিকার তার আছে, কে জানে সে মহামানব হবে কি-না !

ক্ষমা করবেন, হেসে তুমি বললে, সংসার কি তা বোধ হয় আপনি ভালো করে জানেন না, আমি জানি, তাই আপনার কথা আমার কানে সুবিধাবাদীর প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে, বুদ্ধিমতীর যুক্তির মতো--

ক্ষতি নেই, কিন্তু সমস্ত যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বে যে সংস্কার, আমি সেই সংস্কারের মূলে আঘাত করতে চাই—

কিন্তু প্রতিমা আপনি কি বলতে চান ব্যভিচার অন্যায় নয় ?

হ্যাঁ, একশোবার অন্যায়, ব্যভিচার আমি ঘৃণা করি, আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি মঙ্গল আর কল্যাণে, আমি শুধু উড়িয়ে দিতে চাই সংস্কার, যে সংস্কার আপনার আমার মজ্জায়-মজ্জায়—

আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না --

সমস্ত ব্যাপার খুলেই বলি তাহলে আপনাকে, কয়েক মুহূর্তের জন্যে কি ভেবে নিয়ে প্রতিমা আরম্ভ করলো, প্রবীর আমাকে ভালবাসতো, আমি প্রবীরকে ভালবাসতাম, একই ফ্ল্যাটে থাকতাম আমরা দু'জনে, ঠিক ছিল তার পরীক্ষার পর আমাদের বিয়ে হবে।

তারপর ? তুমি একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নিলে তড়িৎ।

এক সুরে গড় গড় করে প্রতিমা বলে গেল, বিয়ে আমাদের হলো না, কিন্তু খোকা হলো আর খোকা হবার অনেক আগেই প্রবীর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। লোকে জানলো বিয়ে আমাদের হয়ে গেছে। একথা কাউকে বলতে না পেরে বুক আমার ছারখার হয়ে যাচ্ছিল, আজ আপনার কাছে মন খুলে আমি বাঁচলাম !

কিন্তু আপনার মা, বাবা তাঁদের কি বললেন ?

আপনাকে যতখানি বললাম তাঁদেরও ঠিক ততখানিই বলবো !

আপনার দর্শন কি তাঁরা মানবেন ?

যদি মানেন ক্ষতি নেই, বাঁধাধরা জীবন আমার জন্যে আর নয়, তাই ঘর বাঁধবার স্বপ্নও আর আমি দেখি না, দরকার হলে খোকাকে নিয়ে ভেসে পড়বো !

সারা জীবন ধ'রে আপনাকে শুধু ভাসতেই হবে, তাহলে খোকা মানুষ হবে কেমন করে ?

সে কথা ভাববার সময় এখন নেই, কিন্তু সত্য, কষ্ট দিলেও

জ্বালা দেয় না, আমার সত্যকে সূর্যের আলোয় আম মেলে ধরবো। আমি জানি, কোন অন্যায়ই আমি করিনি। আজ প্রত্যেকের কাছে মিথ্যা কথা বলে নিজের প্রতিষ্ঠার পথ আমি সহজ করে তুলতে পারি। আমি অনায়াসেই বলতে পারি, আমি প্রবীরের স্ত্রী! একটি লোকও আসল কথা জানতে পারবে না!

তোমার সিগ্রেট ততক্ষণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তড়িৎ, সেই ছোট সিগ্রেটে আর একটা টান মেরে তুমি বললে, ক্ষতি কি প্রতিমা, কেউ যখন সন্দেহ করবে না তখন খোকার মঙ্গলের কথা ভেবে সামান্য মিথ্যা বললে ক্ষতি কি?

হয়তো মিথ্যা কথা বলতে পারতাম যদি বুঝতাম অন্যায় করেছি। আমাদের প্রেম কাঁচা সোনার মতো খাঁটি!

কিন্তু তবু সামান্য মিথ্যায় যদি খোকার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল- -

তড়িৎবাবু, লোককে ফাঁকি দেয়া সোজা, কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দেয়া কঠিন। মিথ্যা বলে নিজেকে ফাঁকি দেবো কেমন করে? না, কিছুতেই আমি তা পারবো না।

সুবিধার খাতিরে কত লোক কত মিথ্যা বলে!

তারা জনপ্রিয় কিন্তু খাঁটি নয়। প্রিয় হওয়া সোজা, খাঁটি হওয়া কঠিন। আমি যদি কারুর প্রিয় না হই, ক্ষতি নেই, কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দিয়ে অন্যের কাছে প্রিয় যেন কোন দিনও না হই, চিরদিন নিজের কাছে যেন আমি খাঁটি থাকতে পারি!

পদে পদে যদি হোঁচট খেতে হয়—কেউ যদি দাম না দেয় তাহলে সে খাঁটিত্বের মূল্য কি ?

খাঁটিত্বের জহুরী মানুষ নিজে, তা অমূল্য, অলিতে-গলিতে খাঁটিত্ব নিয়ে নিলাম হাঁকা যায় না তড়িৎবাবু, তার দাম দেবার ক্ষমতা হয়তো সাধারণের নেই। আমার খোকা তার সত্য পরিচয় নিয়ে বাঁচবে। আপনি সাহিত্যিক, স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে দেখুন ব্যভিচারের মধ্যে দিয়ে খোকা আসেনি, সে এসেছে সোনার প্রেমের মধ্যে দিয়ে--

কিন্তু সংসার যদি চোখ রাঙায়, দারিদ্র্য লজ্জা আর অপমান যদি আপনাদের দু'জনের জীবন বিষময় করে তোলে ? ভুলে যাবেন না সংস্কারে ভরা সংসার—

বাঙলার সংস্কারের চেয়ে বড় আমার প্রেম--

এ সংস্কার শুধু বাঙলার নয়—সমস্ত পৃথিবীর, এ কখনও মানুষের মন থেকে মুছে যায় না !

আমার শুভ্র ন্যায় আত্মার চেয়ে পৃথিবীর কোন মানুষের কোন সংস্কার বড়ো নয় ! লোকের ভয় আমি করি না।

কিন্তু অপবাদ ? যদি আপনি সত্যি কথা বলেন তাহলে লোকে দোষ দেবে প্রবীরের, সে কথা ভেবে দেখেছেন কি ?

সত্য বলে যদি অপবাদ আসে তাহলে তা তার গায়ে লাগবে না। কিন্তু মিথ্যা বলে সুনাম আমি চাই না।

আপনি স্বার্থপর, আপনি ছেলেমানুষ, আপনি শুধু নিজের তৃপ্তিই দেখছেন, খোকার মঙ্গল দেখছেন না।

সত্যই মঙ্গল, মঙ্গলই কল্যাণ! তার বাইরে আর কিছু জানি না!

না, তুমি আর কিছু বলতে পারলে না তড়িৎ। নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দূরে তাকিয়ে রইলে। বহু দূরে আর একটি জাহাজ ভেসে চলেছে, ক্ষণে ক্ষণে তার বাঁশী বাজছে আর শুধু বয়লারের গম্ গম্ শব্দ আর দুরন্ত জলের কলোচ্ছ্বাস!

চুপ করে কেটে গেল কিছুক্ষণ। তোমার আর কোন যুক্তি নেই, বলবারও কিছু নেই। তুমি আস্তে আস্তে আর একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নিলে। সেই গভীর রাত্রে ভাসমান অট্টালিকার এক প্রান্তে তুমি বসে আছো আর যে দৃপ্ত বলিষ্ঠ সতেজ মেয়ে আজ তোমার একেবারে পাশে বসে আছে তেমন মেয়ে তুমি আর কখনও দেখেছ কি? তেমন নির্ভীক পুরুষও তোমার এত কাছে বসেছে কি? বোধ হয় নয়। প্রতিমা আত্মহত্যা করেনি, স্বীকার করেছে প্রেম, খোকাকে বাঁচিয়েছে। তার প্রেমের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে লোকভয়।

হয়তো সমস্ত পৃথিবীতে এমন মানুষ মেলে না, সত্যের জন্যে যে অপবাদ মাথায় তুলে নিতে বিচলিত হয় না। প্রশংসার স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে তুমি আর একবার প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে! চোখ বন্ধ করেছে সে। কিন্তু সে মুখের চার পাশ ঘিরে রয়েছে জ্যোতি। তুমি কিছুতেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না।

কি দেখেছেন ? হঠাৎ এক সময় চোখ খুলে প্রতিমা প্রশ্ন করলো।

আপনাকে—আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

প্রত্যেকে হয়তো আপনার মতো এমন কথা বলবে, সে বিশ্বাস আমার আছে !

সংস্কারে ভরা দেশের কথা জানি না, কিন্তু আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি !

এবার উঠে দাঁড়িয়ে তুমি বললে, এবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক, কাল সকালেই নামতে হবে।

যান আপনি, আমি এখানেই থাকবো, একটু থেমে আবার প্রতিমা বললো, কালকেই ভারতবর্ষ, না ? এত তাড়াতাড়ি—

আপনার বুঝি জাহাজে থাকতেই ভালো লাগে ?

না, মৃদুস্বরে প্রতিমা বললো ভারতবর্ষ এসে গেল, না ! আর ক'ঘণ্টা ?

এইতো ঘণ্টাকয়েক দেখছেন না, ভোর হ'তে আর খুব বেশী বাকি নেই।

ওমা, তাই তো !

তুমি আস্তে আস্তে তোমার কেবিনে এসে শুয়ে পড়লে তড়িৎ। কিন্তু ঘুম এলো না কিছুতেই ? মনে মনে ভাবলে, না এলেই ভালো হতো, হয়তো প্রতিমার সঙ্গে গল্প করার সুযোগ আর তোমার জীবনে হবে না। আর একটু বসলেই তো হতো

ওখানে! তবু এক সময় হঠাৎ কখন তন্দ্রা এলো।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। চমকে বিছানার ওপর সহসা উঠে বসলে তুমি। তীক্ষ্ণ এলার্মের শব্দে বিচলিত হয়ে উঠেছে সমস্ত জাহাজ। প্রচণ্ড কোলাহল আরম্ভ হয়েছে চারিপাশে। লাইফ-বেল্ট নিয়ে দ্রুতবেগে তুমি আবার 'ডেকে' চলে গেলে। কিন্তু তুমি আসবার অনেক আগেই লোকে-লোকে 'ডেক' ভরে উঠেছে। হঠাৎ প্রতিমাকে দূরে দেখতে পেয়ে তার কাছে ছুটে গেলে তুমি। কিন্তু তার চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলে। তার সমস্ত শরীরে এক বিন্দু রক্ত নেই, পাথরের মতো নিস্পন্দ দেহ!

তোমাকে দেখেই সে মন্ত্রচালিতের মতো বললো, খোকা জলে পড়ে গেছে—বলেই অজ্ঞান হয় পড়ে গেল তোমার পায়ের কাছে!

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কেন তোমার মনে হলো সমুদ্রের গভীর থেকে দীর্ণ শিশুকণ্ঠে কে যেন বলছে, না, না, আমি পড়ে যাই নি। মা আমাকে ফেলে দিয়েছে, ভারতবর্ষে নিয়ে যাবার সাহস নেই বলে—

দূরে নতুন সূর্যের আলোয় ভারতের প্রবেশ-তোরুণ ঝলমল করছে! বম্বে এসে গেল!

১৬ই চৈত্র : ১৩৫৪ লণ্ডন : সোমবার বিকেল।

মনে মনে

অতীতের তীর থেকে মাঝে মাঝে হাওয়া দেয়! আর দীর্ণ দিগন্তে শুধু একটানা হাহাকার বাজে। কোথায় কে যেন রাত্রি দিন ফুলে ফুলে কাঁদে। বাইরে বরফের ঝড় আর দুরন্ত হাওয়ায় হাজার ফিসফিসানি!

চিঠির একেবারে শেষের দিকে লেখা ছিল, লোকে তোমায় যত বড়ই অন্যায়কারী বলুক না কেন, আমার শেষ নিশ্বাস ব্যয়িত হবে তোমারই মঙ্গল কামনায়! সমস্ত পৃথিবী যদি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলেও এক মুহূর্তের জন্য আমি ভুলতে পারবো না যে তুমি আমার স্বামী তাই তোমার মঙ্গল-কামনা ছাড়া আমার জীবনে আর কিছু নেই। তুমি সুখী হও! ভ্রমরের লেখা সেই শেষ চিঠি!

দু'তিন দিন ধরে অবিশ্রাম বরফ পড়ছে। শাদা হয়ে গেছে চারপাশ। সমস্ত লণ্ডন নগরীর ওপর পুরু তুষারের আচ্ছাদন। কনকনে হাওয়ার একটানা শব্দে দেহ যেন হিম হয়ে যায়।

হয়তো অসম্ভব। কিন্তু তবু যদি হঠাৎ এক সময়ে লুসেৎ বলে ওঠে, আর আমি তোমাকে এদেশে থাকতে দেবো না, তুমি ফিরে যাও।

অবাক হয়ে সুব্রত তখুনি জিজ্ঞেস করবে, কোথায় ?

তোমার দেশে, তোমার স্ত্রীর কাছে, তোমার মেয়েকে কোলে তুলে নিতে—

বরফের ঝড় উঠেছে। উন্মত্ত হাওয়া মাথা ঠুকে ঠুকে ফিরছে সার্সিতে। কোথায় খুকু—কোথায় ভ্রমর সবই চাপা পড়েছে বরফে। চারপাশে শুধু তুষার আর কিছু দেখা যায় না।

উন্মাদের মতো প্রায় চিৎকার করে সুব্রত নিশ্চয়ই লুসেৎকে বলবে না না না, তাদের কথা আর আমাকে মনে করিয়ে দিও না, আমি পাগল হয়ে যাবো—

কিন্তু আমি তোমাকে পাগল হতে দেবো না, আমি যা বলছি আমি অন্তরের সঙ্গে তাই চাই, তুমি সুখী হও!

আবার সেই তুমি সুখী হও! এ কথায় সুব্রতকে ভীষণভাবে চমকে উঠতে হবে।

সমুদ্রের দুইপারে দুই নারী। হৃদয় জ্বালিয়ে একজন জ্বালিয়েছে তার কল্যাণ-প্রদীপ আর একজন নিজেকে দগ্ধ করে জ্বালাতে চায় তারই যুগ্ম-জীবনের হোমাগ্নি। কিন্তু এদের দুজনকে সে দিল কি ?

উত্তর মেলে না।

সুব্রতর মুখ থেকে আপনা থেকেই বেরিয়ে আসবে, আমি তো অসুখী নই লুসেৎ !

হয়তো লুসেৎ তখন একে একে অনেক কথাই বলে যাবে, আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে নিজেকে প্রতারণা করো না। এই তিন বছরে আমি একদিনের জন্যেও তোমাকে সুখী হতে দেখিনি, এক মুহূর্তের জন্যেও তুমি ভুলতে পারনি তোমার অতীত জীবনকে। মেয়ের নাম ধরে রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে কতবার চিৎকার করে উঠেছো, কতবার চোখের জলে তোমার বালিশ ভিজে গেছে —

তবু তুমি বিশ্বাস করো লুসেৎ, আমি অসুখী নই।

আমি জানি, কিন্তু তুমি মানুষ, তুমি পিতা, তুমি প্রাণহীন নও। তাই আজ আমি তাদেরই কাছে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে চাই, তোমার স্ত্রী হিসেবে এ আমার সব চেয়ে বড়ো কর্তব্য !

কিন্তু তুমি ? তুমি কি করবে ?

আমার জন্যে ভেবো না, প্যারিসে আমার একটা ভালো চাকরী জুটে যাবে। আর আমার পাশে রেখে তোমাকে কিছুতেই আমি এমন উপবাসী থাকতে দেবো না--

অবাক হয়ে লুসেতের মুখের দিকে তাকিয়ে এবার সুব্রত বললে, এতদিন ধারণা ছিল বাঙালী মেয়েরাই শুধু ত্যাগ করতে পারে ; কিন্তু এই তিন বছর তোমার সঙ্গে ঘর করে বুঝেছি, ফরাসী মেয়েরাও কোন অংশে কম যায় না।

তোমাকে দেখলেই লুসেৎ আমার মনে পড়ে আমাদের দেশের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা, তাঁর ফরাসী স্ত্রী হেনরিয়েটার মহিমা অবিস্মরণীয়।

হেসে লুসেৎ সংশোধন করবে, হেনরিয়েটা নয়, বল অরিয়েতা, তাঁদের কথা তোমার মুখ থেকে বহুবার শুনেছি! কিন্তু ওসব কথা থাক। এখানে বসে এভাবে নিজেকে আর কষ্ট দিও না, তুমি ফিরে যাও, তুমি বড়ো হও, আমার স্বপ্ন সার্থক হোক, পৃথিবী তোমাকে জানুক।

একটু ধরা গলায় এবার সুব্রতকে বলতেই হবে, আজ দেখছি সেই বাঁধাধরা পথ দিয়ে যারা চলে তারাই সুখী, তারা নিজেকে সহজেই মানিয়ে নেয় সংসারে। আর আমি? না পেলাম সুখ, না দিলাম কাউকে শান্তি। কি পেলাম জীবনে? শুধু দাহ! হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেললাম!

ছি ছি, তোমার মুখে ওকথা মানায় না, সাহিত্যিকের জীবন নিয়মের রাশ ধরা নয়, অভিজ্ঞতার তালে তালে তার ওঠাপড়া। আজ যা অশান্তি, কাল তা দেবে গভীর শান্তি, ফসল ফলবে তোমার লেখায়!

লুসেৎ, তোমাকে দিয়ে যাবো কি, কি নিয়ে বাঁচবে তুমি?

ভয়ঙ্কর শেষকে আমি ঠেকাতে চাই, আজ আমরা পরস্পরকে ছেড়েগেলে জীবনে কোনদিনও ক্লান্তি আসবে না, সমাপ্তি আসবে না। তুমি যাও, তোমার কলমে বেজে উঠুক জীবনের জয়গান আর দূর থেকে আমরা অশেষকে বাঁধি।

দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেল। এই তিন বছরে সুব্রত ভ্রমরের আর কোন খবর পায়নি—চায়ওনি। তার ছু' একজন আত্মীয় যে এর মধ্যে এদেশে না এসেছে তা নয়; কিন্তু তাদের চোখে সে পাষণ্ড, তাই তার ছায়া মাড়ানো তারা পাপ বলে মনে করেছে আর তাদের এত সহজে এড়াতে পেরে সে-ও যেন বেঁচে গেছে।

তিন বছর! মনে হয় এইতো সেদিন! যেন কয়েক ঘণ্টা হলো হাওড়া থেকে তার ট্রেন ছাড়লো, খুকুকে কোলে নিয়ে সে আদর করলো। ভ্রমরের চোখ ছল ছল করছে। কত বছর দেখা হবে না। আত্মীয়-স্বজনের ভিড়ে ভরে গেছে প্ল্যাটফর্ম। সব কথা সুব্রতর স্পষ্ট মনে পড়ে।

এমনি করেই হঠাৎ একদিন সে বিলেত চলে এলো। আয়োজন ছিলো না, সমারোহ ছিলো না, ছিলো শুধু ভ্রমরের উৎসাহ। কেবলই সে বলতো, তুমি লেখক, তুমি পৃথিবীকে জানো, তুমি বড়ো হও, কিছু ভেবো না, আমি গয়না বিক্রি করে তোমাকে টাকা পাঠাবো—তোমার যশই আমার অলঙ্কার!

সাংবাদিকের কাজ শিখতে অকস্মাৎ সুব্রত সমুদ্র লঙ্ঘন করলো। আত্মীয়-স্বজন ঈর্ষা করলো, বারবার ভ্রমরকে বোঝালো। সুব্রতকে বললো, কি হবে টাকা নষ্ট করে? তোমার স্ত্রী আছে, ছোট মেয়ে আছে, কত বিপদ-আপদ

আছে, এমন করে এ বয়সে বিলেত গিয়ে লাভ কি? তার চেয়ে জমি কেনো, বাড়ী করো—

ভ্রমর বলেছিল, না, বাড়ি-গাড়ির চেয়ে তোমার জীবনে বড়ো অভিজ্ঞতা। মূর্খ আত্মীয়েরা সংসারী, ওরা ঈর্ষা করছে, ওদের কথায় কান দিও না!

এমন করে কোন মেয়ে বলতে পারে! কে পারে নিন্দুক হিংসুক আত্মীয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সমস্ত সংসারের ভার একা মাথায় তুলে নিতে!

সুব্রত জানতো, কোন বিপদেই সাহায্য করবে না কেউ, কিন্তু একচুল এদিক-ওদিক হলে করবে কঠিন সমালোচনা। তবু সে চলে এলো কারণ ভ্রমরের ওপর তার আস্থা ছিলো। যে স্বামীকে এমন করে পাঠাতে পারে, সে অসাধারণ বৈকি!

বিলেতে এসে এক মুহূর্তের জন্যে সুব্রত ভ্রমরকে ভোলেনি—আজও ভুলতে পারেনি। না, ভ্রমরের কান্না তার কানে বাজে, না কাঁদবার মেয়ে সে নয়। স্বামীর ওপর হয়তো অভিমানও তার নেই, কিন্তু—সুব্রত সেকথা কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারবে না। মেয়েটার কথা বড়ো বেশী মনে পড়ে। ঠিক চার বছরের হয়েছে সে। থেকে থেকে লণ্ডনের আলো আর আকাশ যেন ঝাপসা হয়ে যায়।

অতীতের তীর থেকে মাঝে মাঝে হাওয়া দেয়। আর দীর্ঘ

দিগন্তে শুধু একটানা হাহাকার বাজে। কোথায় কে যেন রাত্রিদিন ফুলে ফুলে কাঁদে। বাইরে বরফের ঝড় আর দুরন্ত হাওয়ার হাজার ফিসফিসানি।

হঠাৎ কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল।

প্রথমে মনে হয়েছিল খেলা, দুদিনের খেলা দুদিনেই চুকে যাবে। তারপর এলো ঘুমহীন অনেকগুলো রাত,—কতকগুলো দুঃসহ মুহূর্ত। নিঃশব্দে বন্ধন দৃঢ় হলো, হলো দৃঢ়তরো। খেলা শেষ হলো না, কিন্তু কাঁটায় কাঁটায় ফুল ফুটলো।

ফরাসী মেয়ে লুসেৎ। আধুনিক সাহিত্যে প্রচুর দখল। সুব্রত ভাবলো, ভালোই হল। ফরাসী সাহিত্যের অলিগলির সন্ধান এবার সহজেই পাওয়া যাবে। কিন্তু সাহিত্যের অলিগলি ছাড়িয়ে সন্ধান মিললো মনের অলিগলির।

আর তখনি লুসেৎ বললো, নিজেকে বিস্মৃত হয়ো না, তোমার সংসারের কথা মনে করো—

কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যাব কেমন করে?

আমার চেয়েও বড় তোমার সংসার।

তার চেয়েও বড় তোমার আমার মনের মিল। আমি ছাড়া তোমাকে আর কে বুঝবে? চলো আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে—

ছেলেমানুষী করো না, অতটা নির্লজ্জ হবে কেমন করে? ভ্রমরকে আমি চিনি, সে কিছুই মনে করবে না। তুমি আমার বন্ধু—এই সহজ সম্পর্ক সে সহজেই মেনে নেবে।

কিন্তু বন্ধু, বন্ধুত্বের সীমা তুমি অনেক আগেই ছাড়িয়েছ। ভ্রমরের কাছে মিথ্যা কথা বলে তুমি নিজেকে ছোট করতে পারো, কিন্তু সত্য একদিন প্রকাশ হবেই, তখন আমি তার কাছে মুখ দেখাব কেমন করে ?

আমি তোমাকে বিয়ে করবো লুসেৎ !

তোমার মেয়ে—তোমার ভ্রমর, তুমি কি অমানুষ ?

বাঁধা-ধরা পথ দিয়ে আমি কোনদিনও যাইনি, আজও যাবো না। মানুষ-অমানুষের কথা নয়, কিন্তু শুধু শুধু নিজেদের দুঃখ দিয়ে লাভ নেই। গল্পে-উপন্যাসে বিচ্ছেদ মধুর বাস্তবে নয়। স্বার্থপর হয়ো না, ভুলে যেয়ো না তুমি লেখক। তুমি তোমার একার নও, তুমি দেশের, তুমি দশের !

তাইতো পৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তা করতে চাই।

কিন্তু পৃথিবীকে তো ছোট ঘরে বন্দী করা যায় না, তার চেয়ে লেখায় লেখায় নিজেকে বিলিয়ে দাও দেশে দেশে, তাহলে আপনি পৃথিবী তোমাকে ধরা দিয়ে বলবে, নমস্কার।

তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারবো না।

তুমি কি ভ্রমরকে ভালবাসো না ?

বাসি, কিন্তু একবার ভালবেসেছি বলে আর বাসতে পারবো না, সেকথা আমি মানি না। বারে বারে ভালবাসা পাপ নয়, অন্যায়ও নয়। তোমাকে ভালবেসেছি বলেই বুঝেছি আমি বেঁচে আছি, আমি ফুরিয়ে যাইনি, জুড়িয়ে যায়নি। আর আমার হৃদয় এত ছোট নয় যে তাতে দুজনের জায়গা

হবে না। আমি তোমাদের দু'জনকেই ভালবাসি। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে।

ভ্রমরকে সমস্ত কথা লিখেছ ?

না। কিন্তু তাকে আমি চিনি। সে অসাধারণ। এ ব্যাপারটাকে সে খুব সহজভাবেই নেবে।

তাকে লেখো, তার উত্তরের ওপর আমার উত্তর নির্ভর করবে।

ঠিক ?

ঠিক।

যথাসময়ে উত্তর এলো, অপবাদের ভয় তোমারও নেই আমারও নেই। তোমার সঙ্গে লুসেতের সম্পর্ক আমি বুঝতে পারি, লোকে বুঝবে না! তুমি জানো, লোকজন আত্মীয়-স্বজন আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু গ্রাহ্য করি শুধু একটি মানুষকে—সে আমার মেয়ে। তোমাকে ঘিরে থাকবে অপবাদ আর মা হয়ে সেই অপবাদের মাঝে আমার মেয়েকে আমি বেড়ে উঠতে দেবো কেমন করে!

কিন্তু তোমাকেও বঞ্চিত থাকতে আমি দেবো না। লুসেৎকে তুমি বিয়ে করো, ওদেশেই আবার সংসার পাতো। তুমি টাকা পাঠাতে বারণ করেছ, লিখে ওদেশে টাকা পাচ্ছ শুনে কী যে আনন্দ হচ্ছে বলতে পারি না। আমি তো তাই চেয়েছিলাম। এতদিন পর আমার স্বপ্ন সার্থক হলো। তবু

যখনই টাকার দরকার হবে জানিও, যেমন করে পারি পাঠাবো। আমার কথা ভেবে মন খারাপ করো না, আমি খুব ভালো আছি। লোকে তোমাকে যত বড়ই অন্যায়কারী বলুক না কেন, আমার শেষ নিশ্বাস ব্যয়িত হবে তোমারই মঙ্গল কামনায়। সমস্ত পৃথিবী যদি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাহলেও এক মুহূর্তের জন্যেও আমি ভুলতে পারবো না যে, তুমি আমার স্বামী। তাই তোমার কল্যাণ কামনা ছাড়া আমার জীবনে আর কিছুই নেই। তুমি সুখী হও।

ভ্রমরের লেখা সেই শেষ চিঠি।

হয়তো প্রচণ্ড তুষারপাতের মাঝেও একদিন সুব্রত লুসেৎকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে পারে। এমনদিনে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো তাদের নেশা। রিম ঝিম ফিস ফিস করে কেবলই তুষার ঝরছে। গাছের শাখায় জমা তুষার হাওয়ার ঝাপ্টায় ঝুর ঝুর করে সহসা একসঙ্গে অনেকটা ঝরে পড়ে। তুষার ছড়ানো পথ চলতে চলতে চারপাশে চেয়ে থেকে থেকে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। বরফের বল তৈরী করে খেলা করছে ছেলের দল। তাদের চিৎকারে চারপাশ মুখর হয়ে উঠছে। সব শাদা, পথ-প্রান্তর, গাছপালা, বাড়িঘর তুষারে তুষারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে চারধার।

একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে হঠাৎ এক সময় যদি সুব্রত

বলে ওঠে আমি অনেক ভেবে দেখেছি লুসেৎ, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই যেতে পারবো না।

তা' না হলে তুমি বাঁচবে না, তোমাকে যেতেই হবে।

তোমাকে এমনি করে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে কিছুহৈত স্বার্থপরের মতো চলে যেতে আমি পারবো না।

একদিন ভ্রমরকে ছেড়ে এসেছিলে কেমন করে?

সেদিন ফেরার আশা ছিল। সে যে একেবারে ছেড়ে আসা তা যদি জানতাম তাহলে কিছুতেই আসতে পারতাম না।

কিন্তু তোমার মেয়ে, তার কথা কি তোমার মনে পড়বে না?

শুধু তারই জন্য ফিরতে পারবো না। চিরদিনই সে তার বাপকে মনে করবে অপরাধী। বাপ হয়ে মেয়ের কাছে ছোট হবো কেমন করে!

তবু এখানে থেকেও তুমি তো একদিনের জন্যেও শান্তি পাবে না, আর সে জ্বালা যে আমারই প্রাণে লাগবে সবচেয়ে বেশী।

তুমিই তো বলেছ লুসেৎ, আজ যা অশান্তি কাল তা দেবে গভীর শান্তি—সাহিত্যিকের জীবনে নিজের দুঃখ-বেদনা তার সাহিত্যের চেয়ে বড়ো নয়।

কিন্তু তবু—

আর তোমাকে সজ্ঞানে ছেড়ে যাবো, এত বড় পাষাণ আমি

নই লুসেৎ।

ইচ্ছে করে শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দেবে কেন ?

না, কষ্ট নয়, যদি আমার এতদিনের সাহিত্য-সাধনা জীবনে ক্ষীণতম সার্থকতা এনে থাকে, তাহলে অন্তর দিয়ে বারে বারে শুধু এই কথাটাই বুঝতে চাই, সাহিত্যিকের জীবনে কোন আঘাতই দাগ কাটে না।

কিন্তু ভ্রমর বাঁচবে কি নিয়ে ?

হয়তো তার মেয়েকে নিয়ে। আর একটা কথা শোন লুসেৎ, হয়তো আমার কথা কেউ বুঝবে না, এমনি নিঃঝুম নগরীর মতো বরফে চাপা পড়েছে আমার অতীত জীবন—তাদের বরফ খুঁড়ে টেনে তুললে সকলকেই শুধু দুঃখ পেতে হবে—আগের মানুষ আমরা কেউই আর নেই—

কিন্তু ভ্রমর

এখন হঠাৎ আমি ফিরে গেলে নতুন করে লোকের মুখে মুখে আমার কলঙ্ক ঝালাই হবে। ভ্রমর বা আমার মেয়ে দুজনের পক্ষেই সেটা মঙ্গলকর নয়। যে কথা আজ হয়তো একেবারে চাপা পড়েছে, আবার নতুন করে সেটা ঝালিয়ে সকলকে দুঃখ দেবো কেন!

কিন্তু তুমি কি কোনদিনও দেশে ফেরার স্বপ্ন দেখবে না ?

যদি বলি না, তাহলে আমার মতো দুরাত্মা বোধহয় পৃথিবীতে নেই। তাই ইহজীবনে যে দেশে ফেরা হবে না, সেকথা কোনদিনও ভাবতে পারবো না। আজ শুধু দূরে থেকে দেশের

বন্দনা করে যাবো—

তাহলে ?

রইলুম তোমার কাছে। একটু আগেই তো বলেছি, এতদিনে নিশ্চয়ই আগের ভ্রমর আর নেই, যাকে পেতে যাবো, তাকে যদি না পাই তাহলে শুধু শুধু তোমাকে ভাসিয়ে আমার লাভ কি ? তাই যা ফেলে এসেছি, তা আর নেই, যা ছেড়ে এসেছি, তা আর কেড়ে নেবো না, চলো এগিয়ে যাই—

হয়তো তখন অবিশ্রাম তুষার ঝরছে। রাস্তায় একটি লোকও নেই। চারপাশে শুধু প্রকৃতির সমারোহ।

২রা আষাঢ়ঃ ১৩৫৫, লণ্ডনঃ বুধবার বিকেল

ধমনী

অনেক রাত্তিরে হঠাৎ নাকি ঘণ্টা বেজে ওঠে। বন্ধু ফিরে এসেছে মনে ক'রে লোকটি দরজা খুলে দেয়। কিন্তু বন্ধু নয়, যে এলো তাকে কোনোদিনও দেখেনি। লোকটি এসেই তাকে খালি বোতল দিয়ে কয়েকবার আঘাত করে। আঘাত সহ্য করতে পারেনি যে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। শুধু এইটুকু বুঝেছিলো যে, তার নাক আর কপাল থেকে দর্ দর্ রক্ত ঝরছে।

সমরেশের কানের কাছে মুখ এনে সিম বললো, আর বেশি কিছু আমি জানি না। তবে তুমি আসবার ছ' একদিন আগে পুলিশ এসে ওকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করে গেল—

তাই নাকি এখানে পুলিশ এসেছিলো ?

হ্যাঁ, বলে গেছে আবার আসবে।

আচ্ছা ওর পাশের খাটে যে বুড়ো ভদ্রলোক, তার অসুখটা কি ?

কিছু না। ওর সত্তর বছর বয়স। যখনই ডাক্তার ওকে দেখতে আসে, বুড়োটা প্রচণ্ড কাশির ভান করে আর

ডাক্তারকে ধোঁকা দেবার জন্যে 'বাবা গো, মা গো' বলে চেঁচায়।

সে কি, ইচ্ছে করে কেউ হাসপাতালে থাকতে চায় নাকি? আমি তো বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচি—

তোমার কথা আলাদা, হেসে সিম বললো, তোমার অল্প বয়স, অনেক পয়সা—ও বুড়ো বেচারা কি করবে বল। ওর তিন কুলে কেউ নেই, পয়সাও নেই কিছু। এখানে দিব্যি আরামে আছে। নার্সরা চব্বিশ ঘণ্টা দেখাশোনা করে। খাওয়া-দাওয়া চমৎকার আর একটি পয়সাও খরচ নেই— এতো সুখ ও বুড়ো বেটা পাবে কোথায়?

সমরেশ জিজ্ঞেস করলো, তোমার অসুখটা কি সিম্?

ব্লাড-প্রেসার।

কতোদিন থাকতে হবে তোমাকে হাসপাতালে?

কি জানি, কিছু ঠিক নেই, একটু গম্ভীর হয়ে সিম বললো, আর বেরিয়েই বা কি করবো জানি না—

কেন?

ব্যবসা করতাম, কিন্তু তাতে তো কিছুই করতে পারলাম না। হাতে পয়সা-কড়ি একেবারেই নেই। তবে এখন এই একটা সুবিধা যে, আমার স্ত্রীরও অসুখ, সেও এখন হাসপাতালে। কাজেই খরচ বেশি কিছুই নেই আর ন্যাশনাল হেলথ থেকে যা পাই, তাতে সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু জমাতে পারি।

সমরেশ বললো, তোমাদের দেশে এই বিনা পয়সায়

চিকিৎসা আর যারা চাকরী করে তাদের যতোদিন অসুখ থাকবে, ন্যাশনাল হেলথ থেকে টাকা পাওয়া চমৎকার ব্যবস্থা কিন্তু—

সিম্ গর্বের হাসি হেসে বললো, এ ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোথায় নেই—আমেরিকাতেও নয়—ওষুধ-ডাক্তারের খরচ শুধু এদেশেই কাউকে দিতে হয় না—

ন' নম্বর খাট থেকে হঠাৎ বুড়ো ডেন্টিস্ট চেঁচালো, সিম্ সিম্ দু' চারটে পত্রিকা দিয়ে যাও না বাপু একটু নেড়ে চেড়ে দেখি—

এই যাই, সমরেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিম্ ন' নম্বর খাটের দিকে গেল।

বড়ো ভালো ছেলে, বাঁ দিকের খাট থেকে মিঃ ডেভিস বললো।

লাকি লোক, ডান দিকের খাট থেকে মিঃ হ্যাণ্ডারসান নিষ্প্রভ গলায় উক্তি করলো, সিম্ একাই তবু হেঁটে চলে বেড়াতে পারে, আমাদের তো নড়বার উপায় নেই, পাইপ মুখে দিয়ে হ্যাণ্ডারসান দেশলাই খুঁজতে লাগলো।

সমরেশেরও নড়বার উপায় নেই। লণ্ডনের কোনো প্রসিদ্ধ হাসপাতাল। ওয়ার্ডের নাম কিং জর্জ ফিফথ্ ওয়ার্ড। সেই ওয়ার্ডের কুড়ি নম্বর খাটে সমরেশের জায়গা হলো। বেশ অনেকদিন তাকে থাকতে হবে এখানে। প্লুরিসি হয়েছে তার। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরোবার জন্যে সে ছটফট করে।

আর কেন এ চাঞ্চল্য সেকথা কাউকে বলতে না পেরে অস্থির হয়ে ওঠে।

খুব জব্দ হয়েছে সমরেশ এবার। এখন আর ইচ্ছেমতো কিছু করবার উপায় নেই। আজ বারোটায় খেলাম, কাল তু'টোয় রান্না করলাম, কোনদিন লাঞ্চ খেলাম না—নার্সদের প্রভাবে এখন আর সে সব কিছুই করবার উপায় নেই। সবই ঘড়ি ধরে নিয়ম-মতো—এক মিনিট এদিক-ওদিক হলে চলবে না।

সুন্দর ব্যবস্থা, খুব ভালো খাওয়া আর একটি পয়সাও খরচ নেই। খুব যত্ন করে এরা। কোনো অসুবিধা নেই। তবু থেকে থেকে সমরেশ ঘণ্টা গোণে—কখন লোরা আসবে। দেখা করবার সময় সপ্তাহে তিন দিন। বুধবার, শুক্রবার আর রবিবার। মাত্র এক ঘণ্টা করে। তার ওপর এতো বন্ধু-বান্ধব আসে সমরেশের যে লোরার সঙ্গে একা কথা বলবার অবসর হয় না। তার সঙ্গে এতো কম কথা বলে থাকতে পারবে সেকথা আগে কোনদিন ভাবতে পারেনি সমরেশ। তাই সে কিছুতেই হাসপাতালে আসতে চায়নি। ডাক্তার জোর করে না পাঠালে হয় তো আসতো না।

দেখা করবার সময় হাসপাতালের হাওয়া একেবারে ঘুরে যায়। রোগীরা অধীর প্রতীক্ষা করে তাদের প্রিয়জনের—বন্ধু-বান্ধবের—আত্মীয়স্বজনের। দলে দলে লোক আসতে আরম্ভ করে। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি নানা বয়সের নানা ধরণের

লোক—তাদের হাতে ফুল-ফল আরও কত কি। নিজেদের বিশেষ লোকের কাছে তারা বসে থাকে। কেউ গল্প করে, কেউ সাহস দেয়, কেউ প্রেমের কথা বলে। মাত্র এক ঘণ্টা সময়। কথা কি ফুরোয়? শুধু সেই সত্তর বছর বয়সের বুড়ো—সে শুধু এদিক-ওদিক তাকায় আর খক্ খক্ করে কাশে। তার কাছে কেউ আসে না।

সমরেশের একটা হাত শক্ত করে ধরে অন্য হাতে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো লোরা। কয়েকজন অল্পবয়সী নার্স লোরার দিকে কটমট করে তাকিয়ে গেল। সমরেশের বন্ধুরা সেটা লক্ষ্য করে লোরার সঙ্গে রসিকতা করছিলো।

আগে যদি হাসপাতালে আসতে, আস্তে আস্তে বললো লোরা তাহলে তোমাকে এতো ভুগতে হতো না।

তোমার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে পারবো না বলেই তো আগে আসতে পারি নি।

কিন্তু এখন? কবে বেরুবে তার ঠিক নেই। যাক্ ভালোই হলো, হেসে লোরা বললো, আমার এখন লম্বা ছুটি।

সত্যি কেমন করে দিন কাটবে তোমার?

বলবো কেন? কতো বন্ধু-বান্ধব আছে আমার।

মিথ্যা কথা, আমি ছাড়া তোমার কেউ নেই—

লোরা বললো, কে বললো তোমাকে সেকথা?

তোমার কথা আমি সব জানি।

ওদিকে সমরেশের ডান দিকের খাটের হ্যাণ্ডারসানও বেশ ব্যস্ত এখন। সমরেশ একবার তাকিয়ে দেখে নিলো। আজও মলি এসেছে—নিয়মিত আসে। হ্যাণ্ডারসানের মুখের খুব কাছে মুখ এনে কথা বলছে মলি। সমরেশ ভাবে ওরা নিশ্চয়ই বিয়ে করবে একদিন।

দেখতে দেখতে এক ঘণ্টা কেটে যায়। দেখা হয়ে আসে শেষ। তবু যেতে চায় না কেউ। নার্স আর একবার খুব শব্দ করে ঘণ্টা বাজায়। তাই করুণ চোখে লোরাকে উঠে যেতেই হয়। সমরেশ তখুনি হিসেব করে আর ক' ঘণ্টা পরে আবার লোরার সঙ্গে তার দেখা হবে আর নতুন করে আর একবার মনে হয়, কেন হাসপাতালে এলো সে।

.

নার্স এসে সমরেশকে বললো, এই যে বিস্কুট নাও, সাত নম্বর খাটের মিঃ টমাস দিলেন তোমাকে।

হাত নেড়ে সমরেশ তাকে ধন্যবাদ জানায়। মিঃ টমাস মানে সেই ভদ্রলোক রাত্তিরে বোতলের বাড়ি মেরে গুণ্ডারা যার মাথা ফাটিয়ে দেয়।

ওদিকে ন' নম্বর খাটের ডেন্টিস্ট আর আট নম্বরের উকিলের ঝগড়া বেধেছে। ডেন্টিস্ট নাকি বলেছিলো, জানো ওই ছোকরা ডাক্তারটা আমাকে খালি বোকার মতো প্রশ্ন করে— উকিল গম্ভীর হয়ে বললো, ডাক্তার লোক বুঝে করে, আর তুমিও নিশ্চয়ই চালাকের মতো উত্তর দাও না।

আর যাবে কোথায়! ডেন্টিস্ট উকিলকে এই মারে তো সেই মারে।
উকিল লাফালাফি না করে আরও গম্ভীর হয়ে শুধু বললো, আহাহা অতো উত্তেজিত হয়ো না ডেন্টিস্ট, শেষে অসুখ বেড়ে গেলে অনেকদিন তোমার খাটটা খালি হবে না—অন্য রোগী বেচারারা জায়গা পাবে না।
আর সামলাতে না পেরে ডেন্টিস্ট চেঁচিয়ে উঠেছিলো, সাট্ আপ্!
সি্‌ম্ ছুটে গিয়ে ঝগড়া থামায়। ছি ছি কর কি তোমরা, ইণ্ডিয়ান ছাত্র কি ভাববে ইংরেজ সম্বন্ধে?
এই কথা শুনে চুপ হয়ে গেল ওরা দু'জনে। তাড়াতাড়ি কাগজ পড়ায় মন দিলো।

সমরেশের সম্বন্ধে কৌতূহল প্রত্যেকের, তাকে ভালোবাসে সকলেই। তাকে সকলে অনেক প্রশ্ন করে ভারতবর্ষের কথা জেনে নেয়।
এতো গম্ভীর হয়ে সারাদিন কি ভাবে সমরেশ? পাইপে দীর্ঘ টান মেরে হ্যাণ্ডারসান জিজ্ঞেস করলো।
লোরার কথা, ম্লান হেসে সমরেশ বললো, কবে যে হাসপাতাল থেকে বেরোবো!
ও, তোমার সেই জার্মান বন্ধু, হ্যাণ্ডারসান একটু অবাক হয়ে বললো, তা তাড়াহুড়ো করে বেরোবার কি দরকার?

এসেছো বিদেশে, আগে শরীরটা ভালো করে সারিয়ে নাও---

ডেভিস বললো পয়সাওলা ইণ্ডিয়ান তুমি। গার্ল ফ্রেণ্ড বহু পাবে লণ্ডন শহরে, কিন্তু শরীর—বুড়ো ডেভিস কথাটা শেষ না করে হাসলো।

রেগে গিয়ে ডেভিস আর হ্যাণ্ডারসান দু'জনের উদ্দেশে সমরেশ বললো, চাই না অন্য মেয়ে, জানো লোরা আমাকে কতো ভালোবাসে আর আমিও ওকে--

উচ্ছ্বসিত হয়ে সমরেশ নিজের প্রেমের কাহিনী বলে গেল। কেমন করে আলাপ হলো, লোরা ওর জন্যে কি করেছে, ওরা শীগ্‌গিরই বিয়ে করবে, অমন মেয়ে নাকি পৃথিবীতে আর পাওয়া যায় না।

ডেভিস প্রাণপণে সমরেশের কথার মানে বোঝাবার চেষ্টা করছিলো আর হ্যাণ্ডারসান অবাক হয়ে ভাবছিলো তার মাথাটা হঠাৎ খারাপ হলো কি না– না হলে এতে উচ্ছ্বাস মানুষের হয় কেমন করে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সমরেশ এবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি মলিকে ভালোবাসো হ্যাণ্ডারসান ?

একটু ভেবে হ্যাণ্ডারসান বললো, ঠিক বলতে পারলাম না।

মলি তোমাকে ভালোবাসে নিশ্চয়ই ?

হয়তো বাসে—জানি না।

তোমরা বিয়ে করবে তো ?

অতো কথা তো ভাবি নি।
কতদিনের আলাপ তোমাদের ?
তা প্রায় বছর খানেক—
সে কি. এখনও সম্পর্ক পাকাপাকি করনি তোমরা ? অথচ তিন মাসের আলাপে আমাদের সব বন্দোবস্ত ঠিক।
সমরেশের ব্যাপারে কোনো কৌতূহল না দেখিয়ে হ্যাণ্ডারসান শুধু হাসে, উত্তর দেয় না।

সপ্টেম্বারের লণ্ডন-সূর্য কখনও ম্লান, কখনও উজ্জ্বল। শরৎ এখানে আনন্দের নয়, আশঙ্কার। শরৎ নিয়ে আসে ঝরে যাওয়ার ক্ষণ। তাই শুধু পাতা ঝরে যায়। শীতের কঠিন সঙ্কেতে প্রকৃতি পায় ভয়। সমরেশের মন সহসা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। জানালা দিয়ে সে বাইরে তাকিয়ে থাকে আর মনে হয় সব ভেঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। লোরা এখন কি করছে কে জানে।
রবিবার দিন ছুটতে ছুটতে লোরা এলো দেখা করবার সময় শেষ হবার ঠিক পনেরো মিনিট আগে। সমরেশ কথা বললো না তার সঙ্গে। অভিমানে স্তব্ধ হয়ে গেছে সে।
এই, সমরেশের হাত ঝাঁকিয়ে লোরা বললো, আমি জানতাম তুমি রাগ করবে ডার্লিং, কিন্তু বিশ্বাস কর ঠিক সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম আমি, জানো তো কতদূর থেকে আসি

আমি। আজ রবিবার বলে ট্রেন যে এতো লেট হবে, সেকথা কি ছাই জানতাম—

আরো আগে বাড়ি থেকে বেরোলে না কেন ?

ছুটি পাইনি যে।

আমার জন্যে একদিনও ছুটি নিতে পারো না তুমি ?

একটু অবাক হয়ে লোরা বললো, শুধু শুধু ছুটি নিয়ে কি হবে ?

শুধু শুধু কেন, আমার জন্যে ?

দূর বোকা, এই সব বাজে কারণের জন্যে কেউ ছুটি নেয় ? বছরের ছুটি কমে যাবে যে তাহলে, লোরা হেসে সমরেশের একটা হাত ধরলো, কত কথা বলবার ছিলো তোমার সঙ্গে. কিত এত দেরি হয়ে গেল !

কি কথা ?

লোরা কয়েক মুহূর্তের জন্যে আনমনা হয়ে রইলো, তারপর বললো, আমার বড়ো একা একা লাগে সমরেশ, তুমি কবে বেরোবে হাসপাতাল থেকে ?

জানি না, আমারও খুব খারাপ লাগে।

আহা তোমার তো অসুখ, কিন্তু আমি সুস্থ মানুষ হয়ে কেমন করে একা কাটাই বল তো ?

আমার কথা মনে করে।

এতোদিন তো কাটালাম।

আজ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তুমি কোথায় যাবে লোরা ?

মুটস্‌এর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে।

তোমার বান্ধবী মুটস্‌এর সঙ্গে আজও আমার আলাপ হলো না। কতোদিন বলেছি তোমাকে, তুমিই তো এড়িয়ে গেছো। কেবলই আমার সঙ্গে একা থাকতে চাও।

চাই তো।

ঘণ্টা বাজলো। শেষ হলো দেখা। আবার দেখা হবে বুধবার। সে যে অনেক দেরী। লোরা চলে যেতেই সমরেশ ঝিমিয়ে পড়লো।

সন্ধ্যেবেলা দেশলাইএর বাক্সের ওপর সিগ্রেট ঠুকতে ঠুকতে সমরেশ জিজ্ঞেস করলো, আজ মলি এলো না কেন মিঃ হ্যাণ্ডারসান ?

কি জানি, কিছু কাজ-টাজ পড়েছে হয়তো।

সে কি তোমার মন খারাপ করছে না ?

মন খারাপ করবে কেন ? অন্য কতো বন্ধু-বান্ধব এসেছিলো আমার—গ্রীনিং, কার্কম্যান, ওয়েলস, কতোদিন যে দেখা হয় না ওদের সঙ্গে—

বেশ অবাক হয়ে সমরেশ বললো, লোরার বদলে যদি আমার সমস্ত বন্ধুসমাজ এখানে ভেঙ্গে পড়তো, তাহলেও আমার খুব খারাপ লাগতো।

তার কথা ঠিক ধরতে না পেরে হেসে হ্যাণ্ডারসান বললো, শুনেছি ইণ্ডিয়ানরা বড়ো বেশি ভাবপ্রবণ হয়।

মলিকে সমরেশ শুধু আর একদিন দেখেছিলো। হ্যাণ্ডারসানকে কয়েকটি কথা বলে মিনিট কুড়ি পর সে চলে যায়। কি ব্যাপার জানবার জন্যে সমরেশের কৌতূহল হলো।

আজ মলি এতো তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন, মিঃ হ্যাণ্ডারসান ?

এক নতুন বন্ধু পেয়েছে, তার সঙ্গে দেখা করবে বলে।

সে কি, তোমার অসুখ—

অসুখ বলেই তো নতুন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা দরকার, হেসে হ্যাণ্ডারসান বললো, ছেলেমানুষ ও, একজন রুগীর কাছে এসে শুধু শুধু সময় নষ্ট করবে কেন !

বন্ধু অসুস্থ হলে নতুন লোকের সঙ্গে দেখা না করলে ক্ষতি বিশেষ হয় কি—আর তোমাকে দেখতে আসা তো ওর পক্ষে সময় নষ্ট করা নয়।

পাইপ ধরাতে ধরাতে হ্যাণ্ডারসান বললো, মলি আর আসবে না সমরেশ, এবার থেকে সে তার নতুন বন্ধুর কাছে যাবে।

কিন্তু এতদিনের আলাপ তোমাদের—একদিনে ও সমস্ত সম্পর্ক কেটে দিলো কেমন করে ?

আমার যে অসুখ করে গেল।

তাই তো ওর আরও বেশি কাছে থাকা দরকার—

একটু অবাক হয়ে হ্যাণ্ডারসান বললে, কেন ? আমি সারাদিন যন্ত্রণায় ছটফট করি—মলির অসুখ নেই সে বেচারী কেন আমার জন্যে কষ্ট করবে, ওর জীবনে এখন সবচেয়ে ভালো

সময়—ওকে তো আনন্দ করতেই হবে, মিঃ হ্যাণ্ডারসান কলম খুলে চিঠি লেখায় মন দিল।

সেই রাত্তিরে ভয় পেলো সমরেশ। দুর্বল শরীর, নিস্তেজ মন। কাশি বেড়ে গেল, উত্তাপ উঠলো অনেক, দেহ কাঁপতে লাগলো। অন্য বন্ধু পেয়ে লোরাও যদি এমনি করে ওকে ছেড়ে যায়।

লোরাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছে সমরেশ—অনেক কল্পনা করেছে। সে ছাড়া তার জীবনে আর কোনো চিন্তা নেই। তাকে বিয়ে করবে সমরেশ। তার বাড়ির লোক জানে সব কথা। অসুখ না হলে ওরা এতোদিনে বিয়ে করে দেশে চলে যেতো।

সেই রাত্তিরে অনেক দুঃস্বপ্ন দেখলো সমরেশ। জ্বরের ঘোরে থেকে থেকে চীৎকার করে উঠতে লাগলো। নার্স ভয় পেয়ে ডাক্তারকে খবর দিলো। ডাক্তার প্রথমে দিলো ইনজেকশান, তার পর নতুন কড়া মিকশ্চার দিলে সমরেশকে। তবু শান্ত হলো না সে।

ডাক্তার পরদিন সকালে সমরেশ বললো, আমি বাড়ি যাবো।

শান্তস্বরে ডাক্তার বললো, বেশ তো, আর কিছু দিন যাক্।

না, আমি ভাল হয়ে গেছি, অবাধ্য ছোটো ছেলের মতো গোঁ ধরে সমরেশ বললো, তুমি যা বলবে আমি তাই করবো, আমার দেখাশোনা করবার অনেক লোক আছে আমি আজই বাড়ি যাবো।

কথার উত্তর না দিয়ে ডাক্তার ভালোভাবে তাকে পরীক্ষা করতে লাগলো।

আমি বাড়ি যাবো—

শীগগিরই যাবে।

আমি আজই বাড়ি যাবো ডাক্তার—ডাক্তার

সেই দিন বিকেলবেলা ঠিক তিনটের সময় লোরা এলো। তার হাসিমুখ দেখে অনেক শান্ত হলো সমরেশ। ছি ছি, এমন মেয়েকে কেন সন্দেহ করলো সে!

কেমন আছো?

তোমাকে দেখলেই আমার ভালো লাগে লোরা।

বেচারী, তোমার চেহারা আজ অনেক ভালো দেখাচ্ছে।

কাল সারারাত খুব খারাপ ছিলাম! কেন জানো?

কেন?

আচ্ছা লোরা, কাল তুমি কি করছিলে? লণ্ডনে এসেছিলে নাকি?

না তো—

আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, হাসলো সমরেশ, তুমি যেন এক নতুন বন্ধুর হাত ধরে 'কিউ গার্ডেনস্'এ বেড়াচ্ছো—

কথা শুনে লোরা একটু বিচলিত হয়ে উঠলো যেন।

সে ভাব লক্ষ্য না করে সমরেশ বললো, তুমি আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখ না কেন?

কি লিখবো? জানো তো আমার ইংরেজী বিদ্যার দৌড় আর তুমিও তো জার্মান জানো না।

তবু ইংরাজীতে যা হয় লিখো।

চেষ্টা করবো।

আজ এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে তুমি ?

হাসতে হাসতে লোরা বললো, সাড়ে চারটে থেকে ছ'টা অবধি একজনের মোটরে চড়ে বেড়াবো।

তাই নাকি, কে ?

একজন ভদ্রলোক, মুটস্ তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছে।

সমরেশের মুখে ছায়া নেমে এলো. একদিনের আলাপেই তুমি তার সঙ্গে ঘুরতে বেরোবে ?

তোমারসঙ্গে একদিনের আলাপেই আমি ঘুরতে বেরিয়েছিলাম।

কিন্তু আমি যে তোমাকে বিয়ে করবো লোরা।

তাই বিয়ের আগে তুমি কিছুতেই আমার স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারো না।

বিয়ের পরেও আমি তা করতে পারবো না। শুধু একটা কথা, তোমাকে অনেকবার বলেছি, আবার বলছি, যার তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করো না—অনেক রকম লোক আছে এই লণ্ডন শহরে—

বাধা দিয়ে লোরা বললো, আমি জানতাম তুমি এই সব আজে বাজে কথা বলবে অথচ তুমি জানোই না আমি কার সঙ্গে বেড়াতে যাবো। খুব ভালো লোক সে, বেশ বুদ্ধিমান, জার্মান জানে, আরো ভালো করে শিখতে চায়।

তবু—

দয়া করে আমাকে আর উপদেশ দিও না সমরেশ।

বেশ, তোমার যা ইচ্ছে তাই কর আমি আর কিছু বলবো না।

সেই ভালো, লোরা রেগে চুপ করে বসে রইলো।

পাশের খাটে আধ শোয়া অবস্থায় হ্যাণ্ডারসান চিঠি লিখছিলো। ওদের দিকে অকারণে একবার মাথা তুলে তাকিয়ে আবার লেখায় মন দিলো। সমরেশ ভাবলো মলিকে ফেরাবার জন্যে নানা উপদেশ দিয়ে নিশ্চয়ই সে খুব বড়ো চিঠি লিখছে তাকে।

লোরা, হঠাৎ তার একটা হাত ধরে মিনতি করলো সমরেশ বল এ সব কথা মিথ্যা ?

কি কথা ?

কারুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি, কারুর মোটরে চড়ে তুমি যাবে না—সব মিথ্যা ?

গম্ভীর মুখে লোরা বললো, একজন ইংরেজের সঙ্গে মুটস্ আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছে, সেকথা সত্যি—তার বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশি—পঁয়ত্রিশ।

তাকে তুমি আমার মতো-একদিনেই ভালোবেসেছ নাকি ?

না, বিশ্রী দেখতে সে, অমন লোককে আমি ভালোবাসতে পারবো না। আজ যখন তোমাকে দেখতে আসি, এই হাসপাতালের সামনে একটা গয়নার দোকানে তাকে দেখতে

পেয়ে আমি হাসলাম। সে বললো কোথায় যাচ্ছো ? চলো গাড়ি চ'ড়ে বেড়াই। আমি বললাম, না ধন্যবাদ, আমার বন্ধুকে দেখতে যাচ্ছি। সে বললো তারপর কি করবে ? লোরা হেসে বললো, আমি বললাম, অন্য কাজ আছে—

আজ ঘণ্টা বাজতেই লোরা উঠে দাঁড়ালো, আমি যাই। আর দেখ সমরেশ,একটু থেমে লোরা বললো, রবিবারে আমি আসতে পারবো না। দু'টোর সময় ছুটি পাই পৌনে চারটের আগে এখানে পৌঁছনো সম্ভব নয়। পনেরো মিনিটের জন্যে শুধু শুধু এতদূর এসে কি লাভ ?

বেশ তো, তোমার একটু বিশ্রাম করা দরকার বৈকি।

যদি কিছু মনে না কর, হ্যাণ্ডারসান হাসিমুখে বললো, দয়া করে আমার এ চিঠিটা পোস্ট করে দেবে লোরা ?

নিশ্চয়ই।

অনেক ধন্যবাদ।

লোরা চিঠি নিয়ে বেড়িয়ে যেতেই সমরেশ বললো, তোমার কাছ থেকে অতো বড়ো চিঠি পেয়ে মলি ঠিক ফিরে আসবে হ্যাণ্ডারসান।

মলি ! অবাক হ'য়ে হ্যাণ্ডারসান বললো, মলিকে আমি চিঠি লিখতে যাবো কেন. ওটা আমার আর এক বন্ধুকে লিখলাম।

প্রথমে সমরেশের মাথা ঘুরতে লাগলো। সমস্ত পৃথিবী যেন

দুলছে। বুকের আর পিঠের ব্যথা বাড়লো। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে একেবারে ভেঙে পড়লো। একি হ'লো তার। হঠাৎ এতো দুর্বল হ'য়ে গেল কেন? লোরা কোথায়? অনেক দূরে চলে গেছে। মোটর গাড়িটা কতো বড়ো? কি রঙ তার? এ কী করলো লোরা! স্পীড মিনিটে মিনিটে বাড়ছে। লোরা তাকে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে—দূরে স'রে যাচ্ছে—অন্ধকারে না আলোয়? সমরেশ ঠিক বুঝতে পারলো না। মোটরে ওরা কি এখনও ঘুরছে?

হাসপাতালে লোরা আর মাত্র একদিন এসেছিলো। সমরেশকে শুধু জানাতে যে, সে আর আসবে না।

আর বোধ হয় আমি তোমাকে দেখতে আসতে পারবো না সমরেশ—

কেন?

মানে, মানে ছুটি বড়ো কম আমার নিজের অনেক কাজ করতে হবে—অনেক বেড়াতে হবে।

কিন্তু তোমাকে না দেখে আমি থাকবো কেমন ক'রে?

মাঝে মাঝে আমি তোমাকে দেখতে আসবো নিশ্চয়ই—কিন্তু নিয়ম ক'রে রোজ আসতে পারবো না।

তোমাকে আসতেই হবে লোরা।

না। এতোদিন আমি লণ্ডনে আছি অথচ আর কিছুই দেখিনি শুধু তোমাকেই দেখেছি।

এমন ক'রে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছো কেন ?

স্তিমিত কিন্তু দৃঢ়স্বরে লোরা বললো, আমি ঠিকই বলছি, তোমাকে আমি আর ভালোবাসতে পারছি না—

সমরেশ বিছানার উপর উঠে বসলো, লোরা !

আমাকে মাপ কর সমরেশ কিন্তু যা বললাম তা' সত্যি।

তুমি আমাকে বিয়ে করবে না ?

না।

কিন্তু আমার বাড়ীর সকলে যে আমাদের বরণ করবার জন্যে ব'সে আছে—

তোমাকে আমি ভালোবাসি না—কাজেই কেমন ক'রে বিয়ে করবো বল ?

কিন্তু একদিনে তুমি আমাকে এমনি ক'রে ছেড়ে যাবে ?

একদিনে নয়, তোমাকে যেদিন হাসপাতালে প্রথম দেখতে আসি সেদিন বাইরে বেড়িয়ে আমার নিজেকে মনে হ'লো একেবারে একা—কাউকে চিনিনা—একটাও যাবার জায়গা নেই, সমরেশের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে লোরা ব'লে গেল, আর ভেবে দেখলাম এতো তাড়াতাড়ি বিয়ে ক'রে লাভ নেই, আমার বয়স মোটে কুড়ি, জীবনের অনেক কিছুই জানি না—

সমরেশের গলার স্বর কাঁপছে, লোরা তুমি কি আর কাউকে ভালোবেসেছো ?

না। আমি এখন অনেক লোক দেখতে চাই, অনেকের সঙ্গে বেরোতে চাই এতো কম বয়সে ভালোবেসে কিংবা বিয়ে করে—

তুমি আমাকে বিয়ে না করলে আমি ম'রে যাবো—ম'রে যাবো।

পুরুষের মতো কথা বল সমরেশ, ছি এতো উচ্ছ্বাস তোমার, তাই আমি ঠিক করেছি ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে আর বাইরে যাবো না, ওরা বড়ো ভাবপ্রবণ। একদিনের আলাপেই প্রেমে প'ড়ে বিয়ের স্বপ্ন দেখে পৃথিবীকে ছোটো করে দিতে চায়, লোরা উঠে দাঁড়ালো।

রাগে ফেটে পড়তে চাইলো সমরেশ। কিন্তু একটি কথাও বলতে পারলো না লোরাকে।

তার হাত ধ'রে শুধু বললো, আর পাঁচ মিনিট বসে যাও।

না, আমার কাজ আছে।

মোটে পাঁচ মিনিট লোরা—

আর এক মিনিটও নয়, অনেক পুরোদিন দিয়েছি তোমাকে—

লোরা বেরিয়ে গেল। যাবার সময় সমরেশকে ভালো করে বিদায় চুম্বন দিতে ভুললো না কিন্তু।

হ্যাণ্ডারসান মিঃ হ্যাণ্ডারসান শোনো, যেন বিকারের ঘোরে সমরেশ সব কথা ব'লে গেল তাকে।

সব শুনে আস্তে আস্তে হ্যাণ্ডারসান বললো, এতো ভেঙ্গে পড়ছো কেন তুমি এই সামান্য ব্যাপারে? সেরে উঠে ভালো বন্ধু জোগাড় ক'রে নিও একটা—

আমাকে এই অবস্থায় ও ছেড়ে গেল কেমন ক'রে আমি যে ওকে ভালোবাসি—

তুমি শুধু নিজের দিকটাই দেখছো সমরেশ, ওর কথা ভাবছো না। তার মোটে কুড়ি বছর বয়স। তুমি কতোদিন এখানে থাকবে ঠিক নেই। কি করবে ও একা একা? ও বয়সের মেয়ের পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক।

তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। লোরা বোধ হয় আমার সঙ্গে ঠাট্টা ক'রে গেছে। এ অসম্ভব, এ হ'তে পারে না—লোরা আমাকে এ অবস্থায় ফেলে কিছুতেই যেতে পারে না—নার্স আমার বড়ো কষ্ট হচ্ছে, আমি আর কথা বলতে পারছি না, ডাক্তারকে ডেকে দেবে?

আজ বুধবার। তিনটের সময় নিশ্চয় লোরা আসবে। সমরেশ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিনিট গুণছিলো। কতো লোক বেরিয়ে গেল - কতো নতুন লোক এলো। মাথা ফাটা মিঃ টমাসের আজ বাড়ি যাবার দিন। কারুর সঙ্গে কথা বলবার ক্ষমতা নেই সমরেশের। জ্বর অনেক, মাথায় বড়ো যন্ত্রণা।

মিঃ টমাস 'গুড বাই' জানাবার সঙ্গে সঙ্গে সমরেশ বললো, আমি সেরে গেছি। মিঃ টমাস, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো। আমাকে জানতেই হবে কি ব্যাপার-

যাবে বৈকি, তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো টমাস, শীগ্‌গির

যাবে। এই নাও আমার কার্ড, বেরিয়ে একটা ফোন ক'রো, একদিন চা খেও আমার সঙ্গে—বড়ো পছন্দ করি আমি তোমাকে—
লোরা এলো না।

পরদিন খুব সকালে দু'জন নার্স ব্যস্ত হ'য়ে সমরেশের মৃত-দেহের পাশে দাঁড়িয়ে কি যেন আলোচনা করছিলো। তাদের কথায় ঘুম ভেঙ্গে গেল হ্যাণ্ডারসানের। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারলো না। চুপ ক'রে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সমরেশের মৃত মুখের দিকে। তারপর পাইপ ধরাতে ধরাতে আপন মনেই বলে উঠলো, সিলি বয়।
আর কারুর ঘুম ভাঙেনি তখন। শুধু ঘুমের ঘোরে সেই সত্তর বছরের বুড়ো থেকে থেকে চীৎকার করছে। তা ছাড়া কিং জর্জ ফিফ্থ্ ওয়ার্ডে আর কোনো শব্দ নেই।

১৬ই অক্টোবর : ১৯৫০ : লণ্ডন : সোমবার রাত্রি

কথায় কথায়

কথায় কথায় কি কথা এসে গেল !

তবু যখন শুরু হ'লো, তখন সারা হোক ! কিন্তু নিজেই যে জানি না কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ। এ এমনি একটা কাহিনী জানো শেখর, যার আদিও নেই, অন্তও নেই। তাই থেকে থেকে সব ঝাপসা হয়ে যায়।

বৈজ্ঞানিকের মতে এই পৃথিবীর একটা আরম্ভ আছে আর শেষের কথাও তাদের অজানা নেই। কিন্তু ভুলে ভুলে ভরা মুহূর্তে, মানুষের অন্ধ আত্মবিশ্বাস আর অহঙ্কারের আবিলতায় এই পৃথিবীর প্রাণে প্রাণে কখন কোথা থেকে কী যে জমা হয় কত লক্ষ যুগের কত অপরিশোধনীয় ঋণ! কোথায় তার শুরু, আর কোথায় তার শেষ—সে কথা ব'লে দেবে কোন বৈজ্ঞানিক।

তুমি ভেবোনা শেখর, এমনি জনে জনে নিজের কাহিনী শোনানো আমার অভ্যাস। কিন্তু কেন জানি না, লণ্ডনের এমনি থম্‌থম্ করা রাত্রে, এমনি মূক-বধির অন্ধ কুয়াশায় কে যেন প্রেতের মতো আমার প্রাণের নিভৃতে হানা দেয় ! আর মনে হয়, কেন কাঁদলো না, কেন রাগলো না, মাধুরী কেন মুহূর্তের জন্যে দিশা হারালো না।

সেদিন মাধুরীর চোখ দেখে আমি ভয় পেয়েছিলাম। বোধ হয়, নিদারুণ ব্যাকুলতায় আমার আত্মাও সেদিন কেঁপে উঠেছিলো। কিন্তু আশ্চর্য, তার দৃষ্টিতে রাগ ছিলো না, জ্বালা ছিলো না, ঘৃণাও ছিলো না। মরা মানুষের খোলা চোখের মতো সে-দৃষ্টি! তারপর যতদিন মাধুরী বেঁচে ছিলো, কোন দিনও ওর চোখ থেকে সে-দৃষ্টি দূর হ'য়ে যায়নি।

হ্যাঁ, এমনি ক'রেই দিনে দিনে তিলে তিলে মাধুরী একদিন আমারই চোখের সামনে শেষ হ'য়ে গেল! আমি কিছুতেই তাকে বাঁচাতে পারলাম না!

জানো শেখর, আশ্চর্য আমাদের অহঙ্কার। সত্য যখন বেরিয়ে আসার জন্মে মাথা ঠোকে, অহঙ্কার ক'রে তার প্রকাশের পথ রুদ্ধ আর আত্মাকে কেবলই দেয় দাহ! তাই আমরা নিজে জ্বলি, অপরকে কাঁদাই। সত্যের সহজ পথ ছেড়ে মিথ্যার বাঁকা পথ ধরি, আর অকারণে নিজেকেই শুধু বঞ্চিত করি। কারণ আমরা মূর্খ! সেদিন যদি আমার অহঙ্কার গলা টিপে আমার সত্যকে হত্যা না করতো তাহ'লে এমনি ক'রে এই বয়সে ঘর ভেঙে আমকে পথে পথে মাথা খুঁড়ে বেড়াতে হ'ত না। এমনি ক'রে চীৎকার ক'রে বলতে ইচ্ছে করতো না, জেন্-তুমি কোথায়! পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি তোলপাড় ক'রেও তোমার দেখা আমাকে পেতেই হবে—আমি তোমাকে জানিয়ে দেবো যে—

কিন্তু সেকথা এখন থাক শেখর। কারণ শুধু সেই কথাটাই মাধুরীকে আমি কিছুতেই বলতে পারিনি! কিন্তু তোমাকে আজ আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে। তোমাকে বলতেই হবে কেন আমি মাধুরীকে বলতে পারিনি? কেন কেন কেন?—

তবু বিশ্বাস করো শেখর, আমি আর সব কথাই তাকে বলে-ছিলাম। বলেছিলাম যে, সত্যিই আমি জেনের সঙ্গে খেলা করেছিলাম। প্রবাসের নিঃসঙ্গ দিনগুলি আনন্দমুখর ক'রে তোলবার জন্যে অভিনয়ের চূড়ান্ত করেছিলাম। ভেবেছিলাম তারপর খুশিমতো পলায়ন।

হায় আমাদের আত্মবিশ্বাস! যখন বলি, নিজেকে চিনি, অপরকে জানি, তখন আড়াল থেকে কে যেন টিপে টিপে হাসে। বস্তুতঃ, এই পৃথিবীতে কাউকেই চেনা যায় না। কারণ, মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল মানুষের মন। জীবন কেটে যায়, তবু কি মানুষ নিজেকেই বুঝতে পারে। তা'না হ'লে আমি জেন্‌কে এড়াতে গিয়ে মাধুরীকে হারাবো কেন!

একদিকে জেন্ আর একদিকে মাধুরী, মাঝখানে আমি! সেই আমিই একদিন খেলা খেলতে গিয়েছিলাম—হৃদয় নিয়ে খেলা! কিন্তু তখন তো বুঝিনি, শেষ করতে চাইলেই শেষ করে পালানো যায় না—এ যে জীবনের খেলা, তাই নিঃসাড়ে শিকড় দৃঢ় হয়।

বোধ হয়, মানুষ সব নিয়ে খেলতে পারে, শুধু হৃদয় নিয়ে খেলতে পারে না। তাই সে মানুষ। তাই অন্তরের কোথাও না কোথাও কোনদিন না কোনদিন থেকে থেকে জ্বলে ওঠে অতীতের কত সোনার মুহূর্ত, কত সৌরভ-ঘন দিন, কত ইতিহাস-ভরা রাত। আর মনে হয়, যাকে একদিন খেলা ব'লে শেষ ক'রেছিলে, সে তো খেলা নয়—সে হ'লো তোমার জীবনের পাথেয়। তা'না হ'লে বাঁচবে কেমন ক'রে বল—তুমি যে মানুষ!

এই লণ্ডনে, এমনি এক কুয়াশা-কঠিন রাত্রে, যেদিন আমি জেন্‌কে প্রথম দেখি—সেইদিনই এক সময় তাকে ব'লেছিলাম, আজকের দেখাই যেন আমাদের শেষ দেখা না হয়, বল আবার কবে দেখা হবে?

হেসে বলেছিল জেন্, যখনই তুমি দেখা পেতে চাইবে।

প্রথমে সপ্তাহে একবার, তারপরে তিনবার, তারপর রোজ রোজ দেখা হ'তে লাগলো। তবু তুমি বিশ্বাস করো শেখর, সত্যি সে ছিল আমার খেলা। আমি ভুলিনি মাধুরীকে, ভুলিনি আমার দায়িত্ব। বোধ হয়, শুধু ভুলেছিলাম যে, আমি মানুষ। শুধু বুঝিনি যে, এই খেলাই বাঁধতে পারে আমাকে হাজার ঋণে! মানুষই যে জীবনের ক্রীড়নক, জীবন নিয়ে সে খেলবে কেমন করে! আমরা অবোধ, তাই জীবনের প্রতি পদক্ষেপে শুধু সেই কথাটাই ভুলে যাই।

তাই এক সময় বুঝতে পারলাম, আমাকে পালাতেই হবে।

জেন্‌কে ছেড়ে, ইংল্যাণ্ড ছেড়ে অনেক দূরে আমাকে চ'লে যেতেই হবে—তা'না হ'লে আমার মুক্তি নেই।

কিন্তু পালাবো কেমন ক'রে! বিবেক বাধা দিলো। আমি কি এত বড়ো কাপুরুষ যে, এই সহজ সত্য স্বীকার করতে পারবো না? কার ভয়ে এতখানি হীন হবো আমি। জেন্ আমাকে যা' দিয়েছে, তার তুলনা নেই। আমার যৌবনের প্রান্ত সীমায় সেই তো আবার আমাকে নতুন ক'রে বুঝিয়েছে যে, আমি বেঁচে আছি। না, কিছুতেই আমি পালাতে পারবো না, তাকে আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো।

জানো শেখর, লোকে বলে, বাঙালী মেয়ের মতো ভালো-বাসতে নাকি পৃথিবীর আর কোন মেয়ে পারে না। শুনে আমার হাসি পায়। আমি কেমন ক'রে তাদের বোঝাবো যে, ভালোবাসার কোনো জাত নেই, কোন দেশ নেই—সে যখন দেখা দেয়, তখন ঝড়ের মতো একই রূপে দেখা দেয়, আর চূরমার ক'রে দেয় সংশয় - সংস্কার। তা'না হ'লে সমস্ত জেনে শুনে জেন্ আমাকে ভালোবাসবে কেন! আমাকে কোন দিন পাবে না জেনেও কেন মাথায় তুলে নেবে আমার ভাবনা! আমাকে একদিন হারাতে হবে জেনেও কেন মনে করবে আমি তার চিরকালের মানুষ!

কারণ মানুষ চুলচেরা হিসেব ক'রে ভালোবাসতে পারে না। আর সে যখন ভালোবাসে, তখন জ্ঞান হারায়। তাই জেন্ ইংল্যাণ্ডের আড়ম্বর ছেড়ে বাঙলার অজ

পাড়াগাঁয়ে ঘুঁটে দিয়ে দিন কাটিয়ে দিতেও হয়তো আপত্তি করতো না।

যদি কোনদিন আমার মতো দেশ ছেড়ে দেশে দেশে বেরিয়ে পড়ো, তা'হলে দেখবে ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর পথে পথে। কিন্তু ভালোবাসা পেতে হ'লে ভালোবাসতেও জানা চাই। আমি যেমন আজ সমস্ত পৃথিবীকে ভালোবাসি! কেউ আমার পর নয়। কিন্তু আমার কথা থাক্, জেনের কথাই শোন।

আমি বুঝতে পারছিলাম, অতি দ্রুত হৃদয় ভ'রে যাচ্ছে আর সেখানে জ'মে উঠছে কত নাম-না-জানা জিনিস। আমি বুঝতে পারছিলাম, আর আমার মুক্তি নেই। তবু এর জন্যে দায়ী জেন্। সবটুকু প্রশংসা প্রাপ্য তার। আমাকে সে বিস্মিত করেনি, চমক লাগায়নি মনে, অন্তর দিয়ে দিনে দিনে ফুটিয়েছে অনেক রজনীগন্ধা! নিজেকে অকারণ উৎসর্গ ক'রে আমার দিনগুলি সুধায় দিয়েছে ভ'রে!

সে কেবলই আমাকে বলতো, শুধু একবার বল যে, তুমি চিরদিন আমাকে মনে রাখবে?

তোমাকে ভুলবো আমি!

তুমি হয়তো ভুলবে না। কিন্তু সংসার যে তোমাকে ভুলিয়ে দেবে আমার কথা। আজকের এত কলরব, এ-তো স্বপ্ন হ'য়ে যাবে একদিন, খেলা হ'য়ে যাবে।

যায় যাক্, কিন্তু এ সত্য। হয়তো আজ যা' সত্য, কাল তা'

মিথ্যা, কিন্তু স্মৃতির পথ বেয়ে যাদের আনাগোনা, তারা তো অমর—তাই আমার জীবনে তুমিও অমর জেন্!

কিন্তু সে যে কল্পনাবিলাস!

তাই সে অমর। কল্পনা আর বাস্তবে প্রভেদ সেইখানে। বাস্তব রূঢ়, তাই সে ক্ষণস্থায়ী। দৈনন্দিন আঘাতে চূর্ণ ভস্ম দীর্ণ হ'য়ে যায়। কিন্তু আঘাত আর রূঢ় স্পর্শের উর্ধ্বে কল্পনা, তাই তার মৃত্যু নেই—তুমি আমার সেই কল্পনা জেন্!

এসব কথা বুঝিনা, তোমার কল্পনা আছে তাই তুমি তৃপ্ত। আমার নেই, আমি পেলাম কি, সেই কথাটাই শুধু বুঝিয়ে দাও আমাকে!

তুমি পেলে আমার আত্মা!

আমি চাই তোমাকে তোমার আত্মাকে নয়।

সমস্ত জেনেশুনে?

হ্যাঁ, কারণ তুমি বলেছ, আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি, এবার তুমি আমাকে বাঁচাও। ওগো, তুমি ছাড়া যে আমার কেউ নেই, কি নিয়ে বাঁচবো আমি। তোমাকে চাই না আমি, শুধু প্রতিদিন তোমাকে চোখের সামনে দেখতে চাই। মাধুরীর ঝি হ'য়ে যদি আমি তোমার বাড়ীতে থাকি, তাতে কি ক্ষতি?

জেনের চোখে জল দেখে আমি বিচলিত হ'য়ে উঠলাম। খানখান্ হ'য়ে গেল দায়িত্ব। আমি বলে উঠলাম, ঝি! একি বলছ তুমি!

না হ'লে যে আমার উপায় নেই গো !
হ্যাঁ, তুমি যাবে আমার সঙ্গে, কিন্তু ঝিয়ের মতো নয়, রানীর মতো।
সত্যি বলছো ?
আমার মুখ দেখে বুঝে নাও ! তোমার চেয়ে বড়ো আমার জীবনে আজ আর কেউ নয়।
কিন্তু তোমার স্ত্রী—
তার চেয়েও বড়ো তুমি !
তোমার সমাজ, তোমার অপবাদ—
অপবাদ হবে সোনা !
ঠিক এমনি ক'রেই এই কথাগুলো সেদিন আমি জেন্‌কে বলেছিলাম শেখর। কিন্তু সেদিন বুঝিনি মুখে যত কথাই বলি না কেন, মনের কোণায় লুকিয়েছিল ভয়। যত বেশী জোর দিয়ে যে জাহির করে কাউকে মানি না, সে ঠিক সেই পরিমাণে ভীতু।
তাই এক দুর্বল মুহূর্তে আমাকে আঁকড়ে ধরলো সংস্কার, সংশয় আর ভয়। আমি দিশাহারা হ'য়ে গেলাম। তারপর কি করলাম জানো ? চুপে চুপে নিঃশব্দে এমনি কুয়াশা থম্‌থম্ করা রাত্রে, জেম্‌কে কিছু না জানিয়ে চোরের মতো নিঃশব্দে ইংল্যাণ্ড ছেড়ে পালিয়ে গেলাম।
আজ আবার ফিরে এসেছি শেখর। কিন্তু ফিরে এলেই কি ফিরে পাওয়া যায়। চঞ্চল পৃথিবীতে কে কার অপেক্ষায়

ব'সে থাকে বল! তবু জেন্‌কে আমি একদিন খুঁজে বের করবোই! শুধু বলবো, আমাকে ভুল বুঝনা, তোমাকে আমি ঠকাইনি। এক দুর্বল মুহূর্তে তোমাকে ফেলে পালিয়েছিলাম। কারণ, আমার আত্মাকে তুমি দিয়েছিলে শ্রেষ্ঠ সম্মান—পাছে তোমাকে যোগ্য প্রতিদান দিতে না পারি, তাই আমার ভয় হয়েছিল—তাই তোমাকে দূরে রাখতে চেয়েছিলাম।

একথা ব'লে আমার নিজেরই হাসি পাচ্ছে শেখর। এসব কথা তো ঠিক নয়। তবু মনগড়া মিথ্যা মানুষকে সান্ত্বনা দেয়। বার বার নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝায় সে তো খারাপ নয়। কারণ কোন মানুষই ভাবতে পারে না যে, সে অসৎ। শুধু থেকে থেকে সে জ্ঞান হারায়। কারণ সে মূর্খ। তবুও সে মহৎ। কিন্তু অত কথা বলবোই বা কাকে! জেন্ কি আজও আমার কথা শোনবার জন্যে বসে আছে! হয়তো আমাকে চিনতেই পারবে না। তবু আমি ভাবছি একদিন তার দেখা পাবোই শেখর, ভাগ্যিস আমরা অবোধ· তা'না হ'লে বেঁচে থাকতাম কেমন ক'রে।

কিন্তু মাধুরী অবোধ ছিল না। সে ছিল অতি মাত্রায় বুদ্ধিমতী। আর হয়তো তাই সে বাঁচতে পারলো না।

যদি কাঁদতো, তাহ'লে বুঝতাম থেমে যাবে, যদি রাগে জ্ব'লে উঠতো, তাহ'লে মনে করতাম এক সময় শান্ত হবেই। কিন্তু আশ্চর্য, শান্ত সংযত স্বরে মাধুরী শুধু বললো, তারপর?

তারপর আর কিছুই নেই।

তাহ'লে তার আগের কথা বল ?

বললুম তো, হয়তো যখন জেন্ গ্রীণ্ পার্কে আমার অপেক্ষায় ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে, আমি তখন ভারতবর্ষের জাহাজে চ'ড়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সিগ্রেট ধরিয়েছি !

এ ছাড়া কি আর কিছুই নেই ?

না, তুমি বিশ্বাস করো মাধুরী।

জেনের দিক থেকে ?

বল কি জানতে চাও ?

সেও কি তোমার মতো খেলা খেলেছিল ?

না।

জানতো তোমার বিয়ে হ'য়েছে ?

হ্যাঁ, আমার পথ পরিষ্কার রাখবার জন্যে আমিই তাকে সময় বুঝে সেকথা জানিয়েছিলাম।

তবুও তোমার সঙ্গে আসতে চেয়েছিল ?

হ্যাঁ, কারণ আমি তাকে আশা দিয়েছিলাম সমাজে ভয় আমার নেই। আর তুমি অসাধারণ, তাই তাকে বরণ ক'রে নিতে দ্বিধা করবে না।

তবু তুমি তাকে নিয়ে এলে না কেন ?

হাসিও না মাধুরী। সময় বুঝে আমি পালিয়ে এলাম। কেননা, বুঝতে পারলাম, আমি ছাড়া সে আর কাউকে জানে না। তাই এক সময় ভয় হ'লো পাচ্ছে বেশীদিন খেলা খেললে অভিনয় ধরা পড়ে যায়----

অভিনয় !

জানো, শেখর, মাধুরীর চোখে ফুটে উঠলো সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টি —যা'তে রাগ নেই, জ্বালা নেই। মরা মানুষ কথা বললে যেমন শোনায়, ঠিক সেই স্বরে সে থেমে বললো,

তুমি—তুমি সত্যি অভিনয় করেছিলে ?

হ্যাঁ, ভালোবাসার অভিনয়—

যে তোমায় সব দিল, তোমাকে দিল সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান, সেই সরল মেয়ের সঙ্গে তুমি খেলা করতে পারলে সেকথা আমি বিশ্বাস করবো কেমন করে ?

চুরি ধরা পড়লে লোকে যেমন ক'রে কথা বলে, ঠিক তেমনি ক'রে আমি বলেছিলাম, তুমি বিশ্বাস করো, আমি তাকে এতটুকুও ভালোবাসিনি—কখনও নয় ! জেন্ যখন আমায় এক সুরে প্রেমের কথা ব'লে যেতো, আমি মনে মনে হাসতাম—

না না, মিথ্যা কথা।

মাধুরী—

শুধু একবার বল এ সব কথা মিথ্যা, বল বল সত্যি তুমি জেন্‌কে ভালোবেসেছিলে—

কেন তুমি আমায় বিশ্বাস করছ না মাধুরী ?

ওগো আমি যে কিছুতেই একথা বিশ্বাস করতে পারছি না।

এই তুচ্ছ সামান্য ব্যাপার তুমি এত বড় ক'রে নেবে মাধুরী, সেকথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি—আমি ভাবতে পারিনি

আমার এতো দিনের ভালোবাসার ঊর্ধ্বে ফনা মেলবে তোমার অবিশ্বাস!

অবিশ্বাস! বিমূঢ় বিচলিত দৃষ্টিতে মাধুরী বললো, যদি তোমাকে অবিশ্বাস করতে পারতাম, তাহ'লে আজ সবচেয়ে শান্তি পেতাম আমি নিজে। কিন্তু আমার স্বামীকে একটা স্থূলভ অভিনেতা ব'লে মনে করবো কেমন ক'রে? কেমন করে বিশ্বাস করবো যে সে চোরের মতো পালিয়ে এসেছে!

তাহ'লে বল, আমি কি করলে তুমি খুশি হ'তে?

যদি তুমি জেন্‌কে ভালোবাসতে—যদি তার প্রেম নিয়ে এমন নীচ অভিনয় না করতে—যদি তুমি তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে---

সঙ্গে করে কোথায় নিয়ে আসবো?

এই ভারতবর্ষে, তোমার বাড়ীতে, আমি তাকে মাথায় তুলে নিতাম। মেয়েমানুষের সব চেয়ে বড়ো সম্পদ যে সে তোমাকে উৎসর্গ ক'রছে। তোমার স্ত্রী হয়ে আমার স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণীকে কেমন ক'রে আমি ফিরিয়ে দেবো? কিন্তু একি করলে তুমি!

খুব জোরে হেসে উঠে আমি বললাম, ও তোমার সতী বাঙালী নয়, ওরা এবেলা ওবেলা দু'বেলা ভালোবাসে—

তুমি অমানুষ, তাই একথা বলতে পারছো। কিন্তু জেনে রাখো মেয়েমানুষ শুধু একবারই ভালোবাসে, আর কোন কারণে যদি তাকে না পায়, তাহ'লে অন্য কাউকে বিয়ে

হয়তো সে করে, কিন্তু ভালোবেসে নয়, তার না পাওয়া প্রেমিককে ভোলবাব জন্যে। তাকে শুধু সে বোঝাতে চায়, আমার স্বামী সব দিক থেকে তোমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। আর সারা জীবন সেই ব্যর্থ প্রেম তাকে জ্বালায়—পুরাণো মানুষকে কখনও সে ভুলতে পারে না।

তবু আমি বলতে পারিনি শেখর। একবার ইচ্ছে হ'লো মাধুরীর দু'হাত চেপে ধ'রে বলি, না না না মাধুরী, মিনিটে মিনিটে মানুষ ভালোবাসে, কেউ প্রকাশ করে, কেউ সাহস পায় না। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলাম না সেকথা। হায় আমাদের অহঙ্কার !

জীবনের রঙ্গ এমনি শেখর। মানুষ কাউকেই ঠকায় না। বারবার সে শুধু ছলনা করে নিজেকে। পৃথিবী যখন তাকে বুঝিয়ে দিতে চায় যে সে মহৎ, অহঙ্কার চুম্বকের মতো তাকে আকর্ষণ করে ভুল পথে। হয়তো তাই জীবন মধুর, মানুষ রঙ্গময়।

আমি মাধুরীকে বললাম, তবু তাকে সঙ্গে নিয়ে আসব এমন কথা তুমি বলছ কেমন ক'রে—এতদূর নির্লজ্জ আমি হবো—বাধা দিয়ে মাধুরী বললো, সত্যকে গ্রহণ করায় কোনো লজ্জা নেই, অন্ততঃ তোমার কাছ থেকে আমি তাই আশা করেছিলাম—

জীবন নাটক নয় মাধুরী, ছোট ব্যাপারকে বড়ো ক'রে নিয়ে শুধু শুধু নিজেকে অসুখী ক'রো না।

তোমার কাছে হয়তো ছোট ব্যাপার। আজ যদি তুমি খুন করতে; তাহ'লেও হয়তো আমি এমন করতাম না।

কিন্তু জেন্‌কে ভালোবাসলে এমন ক'রে তোমার পাশে আবার ফিরে আসতে পারতাম কেমন করে ?

শেখর, সেইদিন মাধুরীর হাসি দেখে আমি প্রথম বুঝতে পারলাম কতো করুণ মানুষের হাসি হ'তে পারে !

সে বললো, আমার পাশে ফিরে এসেছ না ? কিন্তু যে ভীরু যে কাপুরুষ, তাকে দেবার তো আমার আর কিছুই নেই— আমার এতো কাছে থেকেও মন থেকে কত দূরে চলে গেছ আজ—

যদি বলি মাধুরী, বাধা দিয়ে আমি বললাম, হয়তো এমনও হ'তে পারে যে, শুধু তোমার কথা মনে ক'রে আমি জেন্‌কে ভালোবাসতে পারিনি ?

তাহ'লে তার জীবনের সর্বস্ব নিয়ে এ খেলা তুমি খেললে কেন ?

তোমার বিরহ ভোলবার জন্যে, প্রবাসের সঙ্গীহীন দিনগুলো আনন্দমুখর ক'রে তোলবার জন্যে।

ছি ছি, আমার স্বামী হ'য়ে এ কেমন কথা বলছ তুমি ! আমি বলতে পারছি না, কিছুতেই বোঝাতে পারছি না কোথায় আমার জ্বালা—তুমি শুধু জেন্‌কে ফাঁকি দাওনি, আমাকে দুঃখ দাওনি—শুভ্র সত্যের গায়ে কালি দিয়েছ। একদিন শেষ রাত্রে তোমার হাত ধ'রে বেরিয়ে পড়েছিলাম, কারণ তোমার

পরিচয়ে বুঝেছিলাম, জীবনে কোন সত্যকে—তা সে যত কঠিন হোক—তুমি কখনও বরণ করে নিতে বিচলিত হবে না—

কিন্তু ভেবে দেখ মাধুরী –

আমি জানি, তুমি কি বলবে! সমাজ, সংসার, সুনাম, অপবাদ—কিন্তু ব্যাপক প্রেম, জীবনের সত্য কি তার চেয়ে বড়ো নয়? আমার ধারণা ছিলো সকলের চেয়ে, এমনকি আমার চেয়েও বড়ো তোমার আত্মার দাবী। না, আজ থেকে তুমি আমার কেউ নও—

কিন্তু মাধুরী, আমি যে তাকে ভালোবাসিনি—ভালোবাসতে পারিনি।

তাহ'লে অভিনয় ক'রে তাকে ছলনা করলে কেন? ওগো, একি আমার সেই তুমি। আমি যে আর তোমাকে সহ্য করতে পারছি না, কেবলই গুমরে গুমরে কাঁদছে আমার আত্মা—

না শেখর, এরপর আর কিছু নেই। তারপর দিনে দিনে মাধুরী ক্ষয়ে গেল! আমাকে দেখতে চাইতো না—বেশী কথাও বলতো না। আর একদিন এমনি ক'রেই ও শেষ হ'য়ে গেল। আমি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর মৃত্যু দেখলাম। মাধুরী চ'লে গেল—জেন্ আমার জীবনে এসেছিল ব'লে নয়, আমি তাকে ভালোবাসতে পারিনি শুনে।

এইবার আমি তোমাকে আমার প্রশ্ন করবো শেখর! নিজেকে সহস্র বার জিজ্ঞেস ক'রেও যে প্রশ্নের উত্তর পাইনি! আমাকে বলতে পারো, কেন আমি মাধুরীর কাছে সহজ সত্যটা স্বীকার করতে পারিনি? কেন আমি তাকে বলতে পারিনি যে, না অভিনয় নয়, খেলা নয়, সত্যি আমি জেনকে ভালো-বেসেছিলাম। এতো ভালো বোধ হয়, মাধুরীকেও কোনদিন বাসিনি। তাকে সত্যি ভালোবেসেছিলাম ব'লেই আমাকে অমন ক'রে চোরের মতো পালাতে হয়েছিল।

সেকথা শুনলে হয়তো মাধুরী বাঁচতে পারতো। কিন্তু কেন তার মৃত্যুশয্যায়ও আমি সে কথা স্বীকার করতে পারিনি? কেন কেন কেন সেকথাটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারো শেখর?

২০শে ফেব্রুয়ারী : ১৯৪৯ : লণ্ডন : রবিবার রাত্রি

সম্মুখ সমরে

হয়তো এমনিই হয়।
কতো কারণে কতো মানুষের বুকে ফুলে ফুলে ওঠে দীর্ঘশ্বাস। মোহ ঠিক নয়—মানুষের নতুন উপলব্ধি। তাই পুরানো ঘর ভাঙে—দেশে দেশে গ'ড়ে ওঠে নতুন বাসর।
কিন্তু পিছন কি সহজে ছাড়ে!

পাড়ার নাম এলিফ্যাণ্ট এণ্ড ক্যাসেল। বেকার লু লাইনের টিউব ষ্টেশন। নাম জাঁকালো হ'লেও লণ্ডনের দীন অপরিচ্ছন্ন পল্লী। ইষ্ট এণ্ড বলা যায়। আদব-কায়দার ধার ধারে না এ পাড়ার লোক তাই দিন রাত গোলমাল লেগেই আছে।
এ পাড়ার কোনো বোমা-বিধ্বস্ত বড়ো বাড়ীর ছোট একটা ঘরে হরেন সরকারের সঙ্গে অশোক থাকে। ওরা তেতলায় থাকে বলে ওদের সঙ্গে দেখা পেতে চাইলে তিনবার কলিং বেল বাজাতে হয়।
খুব সকালে পোষ্টম্যান বাক্সে চিঠি ফেলে বেল্ টিপে জানিয়ে যায় যে—তোমাদের চিঠি আছে। আওয়াজ শুনেই হরেন সরকার ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে নিচে নেমে আসে।

ভারতবর্ষ থেকে আসা এয়ার লেটার হ'লে নাম—ঠিকানা না পড়েই অশোকের হাতে দিয়ে বলে, তোর চিঠি।

সেদিন কিন্তু অশোক চিঠি খুললো না। উল্টে-পাল্টে হরেন সরকারকে বললো, এ চিঠি আমার নয়, আপনার—নিন।

আমার ? অবাক হ'য়ে হরেন সরকার বললো, এয়ার লেটার? ভারতবর্ষ থেকে ?

হ্যাঁ, হাত বাড়িয়ে চিঠিটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে অশোক বললো, ফ্রম্ বন্দনা ঘোষ।

সে কে ? দে তো দেখি—

হরেন সরকার চিঠি পড়তে লাগলো। পড়তে পড়তে তার হাত কাঁপতে লাগলো, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। দীর্ণ স্বরে শুধু বললো, অশোক আমায় ধর, আমি—আমি বোধ হয় প'ড়ে যাবো—

ইষ্টএণ্ডের বোমা খাওয়া বাড়ীর ছোট্ট একটা ঘরে হরেন সরকারের সঙ্গে অশোক থাকবে শুনে তার বন্ধু-বান্ধবরা অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো। প্রথম কথা, ওই পাড়াতে সে লোককে নেমন্তন্ন করবে কেমন করে! ঠিকানা শুনেই তো সকলে নাক সিঁটকোবে। দ্বিতীয়ত, নিজে রেঁধেবেড়ে খেতে হবে, যেটা অশোকের পক্ষে অসম্ভব। তৃতীয়ত, ওই বাড়ীতে ঘরে ঘরে নানা রকম লোকের বাস—বাথরুম মাত্র একটি, কার

কি রোগ আছে ঠিক নেই। ইচ্ছে ক'রে অশোক বিপদ ডেকে আনছে।
কেউ কেউ বললো, শেষে কি বিদেশে থাইসীসে মরবে?
আর একজন বললো, ওটা গুণ্ডার পাড়া, মাথা ফাটবে যে।
শোনো অশোক, শুনেছি হরেন সরকার লোক ভালো নয়।
এসব কথার উত্তরে হেসে অশোক বলেছিলো, সব জানি আমি। খুব সুখেই ছিলাম ইংরেজ পরিবারে। কিন্তু আমাকে এলিফ্যান্ট এণ্ড ক্যাসেলে যেতে হচ্ছে খরচ বাঁচাবার জন্যে। বাড়ী থেকে মাসে দেড়শো টাকার বেশী আর আসবে না। কাজেই যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা করতে হবে তো—
তারপর কোন এক রবিবারে একটা ট্যাক্সি ডেকে মালপত্র চাপিয়ে অশোক ড্রাইভারকে বললো, এলিফ্যান্ট প্লিজ—
ঘর সে আগেই দেখে গিয়েছিলো। তবু আজ সত্যি বাস করতে এসে আর একবার চারদিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলো। অবশ্য দেখবার বিশেষ কিছুই নেই! চারপাশে জমেছে পুরু ধূলো। ইতস্তত ছড়ানো এঁটো বাসন-পত্র। টেবিলের উপর বাটিতে রান্না করা মাংস। আলু কপি আর কাঁচা পেঁয়াজের ঝুড়ি ঝুলছে খাটের কাছে। ঘরে দু'টো খাট। আর একটা বোধ হয় হরেন সরকার বাড়ীওয়ালাকে ব'লে অশোকের জন্যে আনিয়েছে। কিন্তু এতো নোংরা যে সহজে অশোকের ঘুম আসবে না। রাস্তা দিয়ে গাড়ী গেলে ঘর রীতিমতো কাঁপে।

বসুন বসুন, হরেন সরকার বললো, মন খারাপ হ'য়ে গেলো নাকি ?

না না, এই বসছি।

প্রথমে একটু মন খারাপ হবেই, তারপর দেখবেন সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কুড়ি বছর রয়েছি লণ্ডনে, এতো সস্তায়, বুঝলেন অশোক বাবু, কোথাও থাকা যায় না সিগ্রেট না খেলে অনায়াসে একশো টাকায় মাস চ'লে যাবে। দেশের সুসন্তান আপনারা—আমাদের গৌরব, কি হবে এখানে দেশের টাকা খরচ ক'রে ? তার চেয়ে একটু কষ্ট করলে যদি একশো টাকায় চালানো যায়—কেমন কিনা ?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

দু'জনে আমরা সুখেই থাকবো। আমি তো সকাল ন'টায় বেরিয়ে যাই, ঘর তো আপনি একাই ভোগ করবেন। তবে রান্নাবান্না করতে একটু অসুবিধা হবে আপনার। একটু থেমে হরেন সরকার বললো, অসুবিধা আর কি, দু'জনে মিলে সব ঠিক ক'রে নেবো। বিলেতে আর রান্নার হাঙ্গামা কি, ঘরে গ্যাসের রিং রয়েছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে সব হ'য়ে যাবে।

তার কথা অশোক শুনছিলো কিনা ঠিক বোঝা গেলো না। চারপাশে তাকিয়ে ও যেন বেশ দ'মে গেছে। এই প্রায়ান্ধকার ঘরে ওর বোধ হয় হঠাৎ একদিন দম বন্ধ হ'য়ে যাবে আর এই নোংরার মধ্যে ভাপসা গন্ধে ও পড়াশুনোই বা করবে কেমন ক'রে! এ ঘরে যে ওর খেতেও ইচ্ছে করবে না। এ কি

করলো অশোক! কোথা থেকে কোথায়। ওর চোখ ঠেলে কান্না আসছিলো। কিন্তু না, এ সময় ছেলেমানুষী মানায় না। বেশী টাকা আর সে পাবে না, খরচ কমাতেই হবে।

তবু অনেক চেষ্টা করা সত্বেও কিছুতেই সে-রাত্তিরে অশোকের ঘুম এলো না। কারণ এই ঘরে নোংরা বাসনে কিছুতেই সে খেতে পারেনি। চারপাশে তাকিয়ে তার গা গুলিয়ে উঠেছিলো। বিছানায় দারুণ গন্ধ, ওর নাকে জ্বালা ধ'রে গেলো। তার উপর তাকে বাসন ধুতে যেতে হ'য়েছিলো বাথরুমে। কথাটা অশোক আগে জানতো না। অর্থাৎ যে টবে চান করা হয়, এ বাড়ীর প্রত্যেকটি ভাড়াটে সেই টবেই বাসন মাজে। হয়তো কোনোদিন চান করতে গিয়ে সে দেখবে টবের মধ্যে প'ড়ে আছে ছোট একটি হাড় কিংবা মাছের কয়েকটা কাঁটা—ভাবতেই অশোকের গা ঘিন ঘিন্ ক'রে উঠলো। ওদিকে গাড়ীর আওয়াজে ঘর মিনিটে মিনিটে কাঁপছে। আর কে যেন হাতুড়ীর বাড়ি মারছে অশোকের মাথায়। অথচ, সে অবাক হ'লো, পাশের খাটে হরেন সরকার দিব্যি আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। কেমন করে মানুষ এখানে অমন ক'রে ঘুমোতে পারে সেকথা কিছুতেই সে ভেবে পেলো না। অসহায়ের মতো একটার পর একটা সিগ্রেট খেয়ে যেতে লাগলো শুধু।

রাত বোধ হয় অনেক হবে! তবু বাইরে হট্টগোল্লের বিরাম

নেই! মাতালের দল রবিবার উপভোগ করছে। অশোকের মনে হ'লো সে কি সত্যি এখনো লণ্ডনে আছে! তবু সিগ্রেট শেষ ক'রে সে আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা করলো।

তার সিগ্রেট নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুট করে একটা শব্দ হলো। তারপর আবার খুট্—খুটুর—খুট্‌খুট—

এ আবার কি! সেই শীতেও ঘেমে উঠলো অশোকের কপাল। ভূত না চোর? যেমন পোড়ো বাড়ী—কিছুই অসম্ভব নয় এখানে। শব্দ বেড়েই যেতে লাগলো।

মিঃ সরকার? অশোক ডাকলো, শুনছেন? সরকার মশাই—

কি, কি, কি ব্যাপার? ধড়মড় করে উঠে বসলো হরেন সরকার।

কিসের শব্দ হচ্ছে এ ঘরে?

শব্দ, কই?

এখন থেমে গেছে, কিন্তু একটু পরেই আবার হবে, আমি আধ-ঘণ্টা ধরে শুনছি। একটু চুপ করে থাকুন···ওই···ওই শুনছেন?

হরেন সরকার শব্দ শুনে আবার শুয়ে পড়লো, আরে দূর মশাই, ওতেই আপনি চমকে উঠছেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ও কিসের শব্দ?

ইঁদুর, মশাই ইঁদুর!

য়্যাঁ? বিলেতে ইঁদুর, কামড়াবে না তো?

কি জানি, হরেন সরকার নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরলো।

শেষ রাত্তিরে তবু ঘুম এসেছিলো অশোকের। কিন্তু বেশী-ক্ষণ নয়—হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেলো। হরেন সরকার উঠে বসে ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে।

ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো অশোক, কি হলো মিঃ সরকার? ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম আপনার, দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না অশোক বাবু হাঁপানি আছে কি না তাই মাঝে মাঝে বড়ো কষ্ট হয়—

এমনি ক'রে সে রাত ভোর হলো।

ঠিক বলছিলো হরেন সরকার! লণ্ডনের অন্য কোথাও এতো কম খরচে চালানো অসম্ভব। কষ্ট একটু প্রথম প্রথম হয় বটে কিন্তু পরে সব ঠিক হয়ে যায়। আস্তে আস্তে এই ভাঙা-চোরা পোড়োবাড়ীতেই ওর মন দিব্যি বসে গেল। আজ-কাল আর অশোকের গা ঘিন ঘিন করে না, রেঁধে বেড়ে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে মনের আনন্দে পড়াশুনো করে।

কিন্তু থেকে থেকে হরেন সরকারকে তার কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয়। বেঁটে ছোটখাটো মানুষ। চোখে সস্তা চশমা। বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে। অশোকের মনে হয় তার মন যেন গভীর অভিমানে ভ'রে আছে। কোনোদিন কি সে দেশে ফিরবে না? দেশে কি তার কেউ নেই, এমন কোনো আত্মীয় যারা প্রতিদিন বোধ করে তার অভাব! হয় তো নেই। কিন্তু তবুও চিরকাল সে কি কাটাবে এই

সঙ্কীর্ণ গ্যারাটে। অশোক ভাবলো, একদিন সুযোগ বুঝে প্রশ্ন করতে হবে।

কি হে ভায়া, এখন আর খারাপ লাগে কি? তালি দেওয়া কালো ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে রান্না করতে করতে একদিন সন্ধ্যেবেলা হরেন সরকার জিজ্ঞেস করলো।

কি যে বলেন সরকার মশাই, হেসে বললো অশোক, এমন আরামে স্বাধীনভাবে আর কোথায় থাকবো! ইংরেজ পরিবারের খাওয়ায় আমাদের পেট ভরে! আমি তো যে-কদিন লণ্ডনে আছি, এখান থেকে আর নড়ছি না।

আর কতোদিন থাকা হবে বিলেতে?

বছর দুয়েক—আপনি?

আমি? যেন ভীষণ অবাক হলো হরেন সরকার। বোধ হয় আজকাল কেউ আর তাকে এ প্রশ্ন করে না। জোরে হেসে উঠে বললো, আমি যাবো কোথায়?

কেন, দেশে?

দেশ তোমাদের, আমার নয়।

কেন সরকার মশাই?

কারণ—না থাক। আজ নয়। যদি কোনেদিন ইচ্ছে হয় তোমাকে বলবো—শুনো, সে এক আশ্চর্য গল্প—প্রাণপণে কি যেন বলবার চেষ্টা করলো হরেন সরকার, কিন্তু পারলো না, হাঁপাতে হাঁপাতে শুয়ে পড়লো।

বেশী দিন অপেক্ষা করতে হ'লো না অশোককে। এক তুষার রিমঝিম করা দিশাহারা সন্ধ্যায় সহসা মুখের বাঁধন খুলে গেলো হরেন সরকারের, আর গল্প বলতে বলতে বার বার তার চোখ দু'টো ভারী হ'য়ে উঠছিলো। দেহ কেঁপে উঠছিলো সুতীব্র উত্তেজনায়।

ঠিক এমন ক'রে এই গ্যারাটে কুকুর-বেড়ালের মতো আমার থাকবার কথা নয় অশোক। আমি জীবনের সত্যকে স্বীকার না ক'রে আর পাঁচজনের মতো শুধু অভিনয় ক'রে যেতে পারতাম, তা হ'লে একটি লোকও আমাকে দোষ দিত না। কিন্তু আর কেউ না মানুক, আমি জানি কোনো অন্যায় আমি করি নি, আমি শুধু আমার সত্যকে মেনে নিয়েছি।

তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো। তোমাকে আমার আমার প্রেমের ইতিহাস বলা শোভা পায় না। তবু বলবো, কারণ অন্ততঃ একটি লোকও জানুক যে, আমি কাউকে প্রবঞ্চনা করি নি, কাউকে অপমান করি নি—না না অশোক আমার জীবনের দ্বিতীয় প্রেম অন্যায় নয়।

আজ থেকে বিশ বছর আগে আমার স্ত্রীর উৎসাহে আমি বিলেতে এসেছিলাম ব্যারিস্টারী পড়তে। তার ইচ্ছে ছিলো জীবনে আমি প্রতিষ্ঠা লাভ করি—মানুষ হই। আর আমি ঠিক ক'রেছিলাম আমার প্রত্যেকটি দিন সার্থক ক'রে তুলবো বিদেশে, তারপর দেশে ফিরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে চালিয়ে

যাবো সারা জীবনব্যাপী কঠিন সংগ্রাম। উদ্দেশ্য মহৎ—বুঝেছো অশোক ?

হ্যাঁ, নিজেকে উন্নত করার নানা উদ্যমে আমি মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলাম। বোধহয় নিঃশ্বাস ফেলবারও আমার সময় ছিলো না। তারপর আস্তে আস্তে আমার সমস্ত গোলমাল হ'য়ে গেল। হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে আমি দেখলাম আমি যেন অন্য মানুষ হ'য়ে গেছি, আমার অতীত নিজের কাছে মিথ্যা ব'লে মনে হ'লো।

এইবার সেই কথাই বলি। তুমি খুব ভালো ক'রেই জানো এ দেশে মেয়েদের সঙ্গে মেলমেশা করার প্রচুর সুযোগ। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব—এমন কি যারা শ্বশুরের পয়সায় বিলেতে এসেছিলো—তারাও শুধু মেয়েদের সঙ্গে মেশেনি, তাদের ঠকিয়েছ, ভালোবাসার অভিনয় ক'রে যথাসময়ে শ্বশুরের সু-জামাতার মতো খেলা শেষ ক'রে দিয়ে দেশে ফিরে গেছে।

শুধু আমিই শেষ অবধি ফিরতে পারলাম না। কিন্তু তা'তে আমার এতটুকুও দুঃখ নেই অশোক! জানি এই জঘন্য পল্লীতে হঠাৎ একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে আমার চোখের তারা বড়ো হবে—আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। না, এই বিদেশে বিভুঁয়ে কুকুরের মতো মরতে আমার লজ্জা নেই—সে আমার সব চেয়ে সেরা আনন্দ। আর কিছু করতে পারি আর না পারি, অন্ততঃ আমি যে এমন ক'রে মরবো শুধু

আমার সত্যের জন্য, সে-কথা ভাবতেও আনন্দে মন ভ'রে ওঠে। জীবনের শেষদিনে সেই তো আমার পরম লাভ। আমি সেই মহামরণের দিন গুণছি অশোক।

কিন্তু বার্থাও তো শেষ অবধি রইলো না। রইলো না বললে ভুল হবে, থাকতে পারলো না। আমার অন্যান্য বন্ধুরা শ্বশুরের পয়সায় এসেও মেয়েদের কাছে যেমন বিয়ের কথা চেপে যেতো, আমি ঠিক তেমনটি করতে পারি নি। আমার কথা আমার প্রত্যেকটি বন্ধুবান্ধব জানতো।

সব জেনে শুনেও বার্থা আমাকে ভালবাসলো। আর আমিও প্রতিদান দিতে বাধ্য হলাম—তাকে কিছুতেই ফেরাতে পারলাম না।

তোমরা এ-কথা শুনে বলবে, আপনি অন্যায় ক'রেছেন। আবার ভালবাসবার আপনার কোনো অধিকার ছিলো না —আপনার স্ত্রী আছে, আপনার মেয়ে আছে, তাদের কথা আপনি ভুললেন কেমন ক'রে? আপনার কি এতোটুকুও কর্তব্যবোধ নেই? সামান্য দায়িত্বজ্ঞান নেই?

সবই আছে, সবই ছিলো, তোমাদের সব কথা আমি মানি অশোক। কিন্তু শুধু একটা কথা কিছুতেই তোমাদের বোঝাতে পারবো না যে, সত্যকে বাদ দিয়ে মন্ত্রের মতো আমি শুধু কর্তব্য ক'রে যাবো কেমন ক'রে! নিজের সঙ্গে দিনরাত সংগ্রাম ক'রে আমি বুঝেছিলাম আমার মনের দুর্বার গতি রুদ্ধ করবার কোন উপায় নেই। যেন অদৃশ্য

শক্তির হাতে আমি একেবারে অসহায়। এই বয়সের কঠিন উপলব্ধি যে কখনও ভুল ব'লে মনে হবে না, সে-কথা স্পষ্ট বুঝেছিলাম। তাই ঠিক করলাম দেশে আর ফিরবো না। স্ত্রীর সঙ্গে শুধু অভিনয় ক'রে তাকে অপমান করতে পারবো না।

গরীবের ছেলে আমি ছিলাম না অশোক। জানতাম আমার বাবার বাড়ীতে আমার স্ত্রী মেয়ের কোনো অভাব হবে না। তবু সত্য স্পষ্ট স্বীকার ক'রে আমার স্ত্রীকে সব কথা লিখলাম। কোনো উত্তর এলো না। এলো বাড়ী থেকে গুরুজনদের ঘন ঘন নানা রকম চিঠি আর মাসে মাসে টাকা আসা হঠাৎ এক সময় বন্ধ হয়ে গেলো। তবু নানা উপায়ে অনেক দিন পড়াশুনা চালিয়েছি, কিন্তু কিছুতেই শেষ অবধি তরণী তীরে নিয়ে যেতে পারলাম না। পড়াশুনা ছেড়ে আমাকে ইংরেজ আপিসে কেরাণী হ'তে হ'লো। আজও তার জের টেনে চলেছি।

না অশোক, বার্থাকে আমি বিয়ে করি নি। কারণ বছর-খানেক পর সে আবিষ্কার করলো যে আমার সম্বন্ধে তার আর কোনো কৌতূহল নেই। তাই সেও আমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় না করে আমাকে ছেড়ে গেলো।

তুমি বলবে, তখন আপনি দেশে ফিরে গেলেন না কেন। কেন ফিরে যাবো? আমার স্ত্রীকে যদি আমি একদিন স্বীকার না করে থাকি, যদি বুঝে থাকি তাকে ভালবাসিনি,

তা হ'লে তার কছে ফিরে যাওয়া কি তাকে সব চেয়ে বড়ো অপমান করা নয় ? আমি তা করতে পারি নি।
আমি আজ আর বেশী কিছু বলতে পারবো না, কথা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে—এখুনি হাঁপানি সুরু হবে। শুধু খুব জোর দিয়ে তোমাকে আমি এই বথাই বলতে চাই যে, আমার কখনও নিজেকে অপরাধী মনে হয় না। কারুর প্রতি কোনো অন্যায়ই আমি করি নি। হ্যাঁ, মাথা উঁচু করে চলবার ক্ষমতা আমার আছে। আমি মুক্ত কণ্ঠে শুধু আমার সত্যকে ঘোষণা করেছি প্রত্যেকের কাছে, মিথ্যার মুখোস প'রে কাউকে ছলনা করিনি, তাই আমার আর কাউকেই ভয় নেই।

ভারতবর্ষ থেকে আসা হরেন সরকারকে লেখা বন্দনা ঘোষের এয়ার লেটার—

শ্রীচরণেষু,

বাবি, তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। তুমি যখন বিলেত যাও তখন আমার বয়স তিন বছর। তোমাকে আমার একটুও মনে নেই। তোমাকে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে। তাই আমি আর তোমার জামাই লণ্ডনে যাচ্ছি। সাত আটদিন থাকবো।
গত বছর আমার বিয়ে হয়েছে। তোমার জামাই-এর নাম অচিন্ত্যকুমার ঘোষ। ও অফিসের কাজে আমেরিকা যাচ্ছে।

সেখানে ছ'মাস থাকতে হবে। তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমরা লণ্ডন হয়ে যাচ্ছি।

আমাদের জাহাজের নাম সিলিসিয়া। বম্বে থেকে ছাড়বে বারোই সেপ্টেম্বর। সাতাশ কিংবা আটাশ তারিখে আমরা লণ্ডনে পৌঁছবো। তুমি স্টেশনে আসবে তো বাবি ?

আমার বিয়ের তিন মাস পর মা মারা যান। তাঁর শরীর শেষের দিকে খুব খারাপ হয়ে পড়েছিলো। যাবার সময় আমার হাত ধরে তিনি বলে গেছেন, তোর বাবির সঙ্গে যেমন করে হোক একবার দেখা করিস খুকুমণি। বলিস, মা তোমাকে প্রণাম জানিয়ে বলে গেছেন, তাঁর মনে কোন ক্ষোভ ছিলো না। তুমি যেন জীবনের শেষ দিন অবধি সুখী হতো পারো, এই প্রার্থনা করতে করতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

আজ শেষ করি। তোমার সঙ্গে শীগ্গিরই দেখা হবে বলে খুব ভালো লাগছে। প্রণাম নিও। ইতি—

তোমার খুকুমণি

খোলা এয়ার লেটার হাতে নিয়ে হরেন সরকার কাঁপছিলো। অশোক যদি তখুনি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ধ'রে না ফেল্‌তো তা হ'লে হয়তো ঠাণ্ডা মেঝেতে সত্যি হরেন সরকার পড়ে যেতো।

কি হ'লো সরকার মশাই ? কোনো খারাপ খবর নাকি

ব্যস্ত হ'য়ে অশোক জিজ্ঞাসা করলো, আপনি অমন করছেন কেন?

কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে অশোকের দিকে চিঠিটা বাড়িয়ে দিয়ে সরকার বললো, পড়।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চিঠি শেষ করলো অশোক। তারপর শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, আপনি অতো বিচলিত হচ্ছেন কেন সরকার মশাই?

আমার স্ত্রী মারা গেছে, থেমে থেমে হরেন সরকার বললো, কিন্তু অশোক, তার চেয়েও খারাপ খবর হলো আমার মেয়ে জামাই সাতদিন পর এখানে আসছে।

খারাপ খবর? কি বলছেন আপনি? তাদের দেখতে কি আপনার ইচ্ছে করে না?

করে। কিন্তু—কিন্তু আমি যে তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবো না—কিছুতেই না—

সে কি কথা সরকার মশাই?

ওরে অশোক, আমি কিছু জানি না—কিছু বলতে পারবো না, কিন্তু আমাকে পালাতেই হবে।

এই নোংরা বাড়ীর কথা ভাবছেন?

এখানে তাদের ওঠাবো না নিশ্চয়ই, ম্লান হেসে হরেন সরকার বললো, আমার একটা উপকার করবি অশোক?

বলুন?

তোকে যেতে হবে স্টেশনে ওদের আনতে, লণ্ডনের সব চেয়ে

বড় হোটেলে তুলবি তাদের, আমি আজই ঘর ঠিক করে রাখবো, আমার যা কিছু সঞ্চয়, সব খরচ করবো তাদের জন্যে। তুই শুধু মা-মণিকে বলিস যে, আমি লণ্ডনে নেই, বিশেষ দরকারে বাইরে গেছি—যা হয় বলিস, আমি কিছুতেই পারবো না রে—

কিন্তু কেন সরকার মশাই ?

কিছু বলতে পারবো না। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করিস না অশোক। আমি চলে যাবো—আমি পালিয়ে যাবো—কিছুতেই তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবো না—বল তুই স্টেশনে যাবি আর বলবি আমি এখানে নেই ?

হরেন সরকারের উত্তেজনা দেখে তাড়াতাড়ি অশোক মাথা নেড়ে জানালো যে—সে তা-ই করবে।

একটি লোকের শরীর মাত্র সাতদিনে যে এমন ক'রে ভেঙে পড়তে পারে, সেকথা হরেন সরকারকে চোখের সামনে না দেখলে অশোক হয়তো বিশ্বাসই করতে পারতো না। হাঁপানি বেড়ে গেলো তার, চুল আরও বেশী পাকলো, চোখের কোণে পড়লো কালি আর বলতে গেলে কথা বলা সে একেবারেই বন্ধ করলো।

আজ তাদের লণ্ডনে পৌঁছবার দিন। জাহাজ লাগবে সাউদাম্পটন বন্দরে। সন্ধ্যেবেলা ওয়াটারলু স্টেশনে আসবে বোট স্পেশ্যাল।

এলিফ্যাণ্ট এণ্ড ক্যাসেল থেকে ওয়াটারলু স্টেশন বেশী দূরে নয়। মাত্র মিনিট কয়েকের পথ। অশোক যথাসময় প্রস্তুত হ'য়ে নিলো। সরকার মশাই-এর মেয়ে জামাইকে তোলা হবে শ্যাভয় হোটেলে। স্টেশন থেকে খুবই কাছে। নাম করা আমেরিকান হোটেল।

ওরে অশোক, স্তিমিত স্বরে বললো হরেন সরকার, দেখিস আমাকে যেন কিছুতেই না সামনে পড়তে হয়—

ঠিক আছে সরকার মশাই, কিন্তু আপনি এবার উঠে বসে কিছু খেয়ে নিন—কি চেহারা করেছেন দেখতে পান না?

হাঁপাতে হাঁপাতে হরেন সরকার বললো, উঠবো কেমন ক'রে? শরীরে যে কিছু নেই—

সব আছে, ডাক্তারের কাছে একবার গেলে এতো কষ্ট হ'তো না আপনার। কিছুতেই তো গেলেন না!

যাবো রে যাবো, ওরা চ'লে যাক। কিন্তু তুই এবার বেরিয়ে পড় অশোক, সময় হ'য়ে গেলো যে—

হ্যাঁ যাই, দরজার হুক থেকে ওভার কোটটা নিয়ে গায়ে দিয়ে অশোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

কিন্তু সে-ট্রেনে এলো না ওরা কেউ। অনেক প্যাসেঞ্জার নাকি এসেছে এ জাহাজে, তাই আর একটা ট্রেন আসবে ঘণ্টা দু'য়েক পর, আর সেই গাড়ীতে আসবে হরেন সরকারের মেয়ে জামাই।

এই শীতে স্টেশনে দু'ঘণ্টা অপেক্ষা না ক'রে অশোক ঠিক করলো বাড়ী ফিরে যাওয়াই ভালো। কাছেই তো! আবার ঠিক সময় ফিরে এলেই চলবে।

ভরা কুয়াশায় সেদিন থম থম করছে লণ্ডন শহর। রবিবার। তাই মদের দোকান থেকে ভেসে আসছে নরনারীর কোলাহল। আর এলিফ্যাণ্ট এণ্ড ক্যাসেলে এসে অশোকা দেখলে রাস্তায় উল্লাস করছে মাতাল পথিকের দল। হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে সে দরজার হ্যাণ্ডেল ঘোরালো।

কে, কে, কে—ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই খাটের ওপর সশব্দে ট'লে পড়লো হরেন সরকার।

অশোক উত্তর দেবার অবকাশ পেলো না। তাড়াতাড়ি ছুটে এলো খাটের কাছে। বিচলিত হয়ে হরেন সরকারের গায়ে হাত দিয়ে দেখলো—নিস্পন্দ তার দেহ, আর স্থির চোখের মণি। কিন্তু মুখের চারপাশে তখনও ফুটে রয়েছে ভয়ের সুস্পষ্ট রেখা।

লণ্ডনের সেই দীনতম পল্লীর জীর্ণ গ্যারেটে তখন শুধু কাঠের ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। গাড়ীর আওয়াজে ফাটা দেয়াল কাঁপছে বার বার—তারই একটানা শব্দ। আর রাস্তায় মাতালের ক্লান্তিকর অবিশ্রাম চীৎকার।

১লা জানুয়ারী : ১৯৫২ : কলকাতা : মঙ্গলবার, সন্ধ্যা

বাহিনী

রাস্তার নাম অন্য কিন্তু হাটের নাম পেটিকোট লেন বাজার। ইস্টএণ্ডে সপ্তাহে একদিন হাট বসে। রবিবার সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা। কিন্তু ভাল করে হাট বসতে বসতে বেলা ন'টা—সাড়ে ন'টা বেজে যায় আর ভাঙতে ভাঙতে দুপুর দু'টো আড়াইটা। শীতকালে আরও এদিক-ওদিক। লণ্ডনের বনেদি পাড়া থেকেও পেটিকোট লেন বাজারে খদ্দের আসে। জিনিষপত্রের দাম আশ্চর্য রকম সস্তা। মোটা মোটা মুর্গী মোটে পাঁচ-ছ' শিলিং। ওয়েষ্টএণ্ডের বাজারে প্রায় দ্বিগুণ দাম। তাছাড়া ঘটি-বাটি, থালা-বাসন, পুতুল-বেলুন, তরীতরকারী, ফলমূল—সব কিছুই খুব কম দামে পাওয়া যায়। তবু খদ্দের দর করতে ছাড়ে না। একমাত্র পেটিকোট লেন বাজারেই বোধ হয় এটা চলে।

ঠিক করে বল কত নেবে?

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে আড়চোখে খদ্দেরের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বুড়ো দোকানী বলে, কেন, খুব সস্তা মনে হচ্ছে বুঝি? নেবে নাও নাহলে সরে পড়, বিরক্ত কোরোনা আমাকে—

খদ্দের রাগে না। হেসে বলে, ছ' শিলিং হবে ?

কি ! চোখ যেন বড় হয়ে যায় দোকানীর। রসিকতা হচ্ছে বুঝি আমার সংগে ? আট শিলিং-এর এক পেনি কম হবে না। দেখনা বাজার ঘুরে এমন চায়ের বাসন এ তল্লাটে আর পাও কি না।

তাই দেখি, খদ্দের আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়।

অই মিষ্টার, সেই দোকানদার চীৎকার করে বলে, এসো, এসো, আচ্ছা ছ'শিলিং কমিয়ে দিলাম নাও !

উঁহু, খদ্দের মাথা নাড়ে, বলেছি তো যা দাম দিতে পারবো আমি। আবার কিছুক্ষণ দরাদরি, কথা কাটাকাটি তারপর চার কি পাঁচ শিলিং-এ রফা হয়।

চায়ের সরঞ্জাম ভাল করে কাগজে জড়িয়ে খদ্দেরের হাতে তুলে দিতে দিতে দোকানদার বলে, তোমার মত খদ্দের আর ছ'চারটে এলে হয়েছে আর কি, ব্যবসাপাতি গুটিয়ে সরে পড়তে হবে আমাদের।

কি যে বল ! আমি তো বেশী দাম দিলাম তোমাকে।

হ্যাঁ খুব দিয়েছ, দোকানদার কটমট করে তাকিয়ে বলে আর তাই শুনে হাসতে হাসতে খদ্দের এগিয়ে যায়।

বাজারের সর্বত্র এই এক ব্যাপার। কোথাও নাক লম্বা ইহুদী বুড়ীর দল চীৎকার করছে, কোথাও যুবতী মেয়ে ফলের ঝুড়ি সামনে নিয়ে খদ্দেরের হাত ধরে বলছে, এসো দেখনা একবার তাজা ফলের দিকে, তোমার কি চোখ নেই ডার্লিং ?

খেলনাওয়ালা কি একটা হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছে আর তাই শুধু শব্দ হচ্ছে, চর্ চর্ চট্—রীতিমত গোলমাল, চেঁচামেচি, হৈ-হৈ কাণ্ড।

মাথার ওপর ছাদ নেই। খোলা জায়গা। নিজের বিশেষ জায়গায় যে যার জিনিষপত্র সাজিয়ে বসে। এই হাটে বসে তারা যে সকলেই ইষ্টএণ্ডের লোক তা নয়। অনেক দূর থেকে মোটা ঘাট নিয়ে ছত্রিশ জাতের লোক দু'পয়সা করবে বলে এখানে আসে। সুযোগ বুঝে আবার একটা রেস্তোরাঁও খোলা হয়েছে বাজারের মধ্যে। এক কাপ চায়ের দাম দু' পেনি! চা ছাড়া আর কিছু খেতে ইচ্ছে করে না এখানে। নাকে ভ্যাপসা গন্ধ লাগে আর রেস্তোরাঁর কর্তা-গিন্নীর চেহারা দেখে প্রচণ্ড ক্ষিধে পেলেও খাবার ইচ্ছে উড়ে যায়। তবু রয়েছে অনেক কিছু। কেক-বিস্কুট, সসেজ-রোল, অমলেট-কাটলেট আরও কত কি। মাছ ভাজার ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ আসে। পরিবেশনের কাজটা গিন্নীই চালিয়ে নেয়। মোটা গোলগাল চেহারা। থপথপ করে ঘোরাঘুরি করে খদ্দেরকে আপ্যায়ন করে। গিন্নীর সুস্পষ্ট গোঁফের রেখাটি চোখে না পড়ে উপায় নেই। এই ছোট অপরিষ্কার রেস্তোরাঁ ছাড়া আর কোন চা খাবার জায়গা নেই পেটিকোট লেন বাজারের মধ্যে। তাই কেনাকাটা আর দরাদরি করতে করতে লোকের যখন গলা শুকিয়ে যায় তখন তারা চোখ-কান বুজে কোন রকমে শুধু এক কাপ চা খেয়ে যায় এখান থেকে।

অনেক গল্প ছড়ানো আছে এই হাট সম্পর্কে। এখানে নাকি নোট দিলে খদ্দেরের পকেট মেরে দোকানদার চেঞ্জ ফেরৎ দেয়—কে যে কখন হাতে গলা কাটে কিছুই বলা যায় না। আরও কত গল্প। তাই শুনে যারা লণ্ডনে বেড়াতে আসে তারা যাদুঘর, চিড়িয়াখানা দেখে সময়মত প্রচুর কৌতূহল নিয়ে শুধু মজা দেখবার জন্যে পেটিকোট লেন বাজারেও বুড়ী ছুঁয়ে যায়।

মোটামুটি এই হল পেটিকোট লেন বাজার। ভ্যাপ্‌সা গন্ধ, গোলমাল, নানা জাতের নানা বয়সের নরনারীর ভীড়। চার-পাশ বড অপরিচ্ছন্ন। লোকে এদিক-ওদিক পিক পিক করে থুতু ফেলে।

পেটিকোট লেন হাটে ঢুকে সোজা এগিয়ে ডানদিকে বেঁকতে হয়, কিছুদূর হাঁটবার পর আবার বাঁদিকে—তারপর বেশ কয়েক পা চলবার পর গোকুলের মুর্গীর দোকান। জ্যান্ত নয়—কাটা। ঠিক দোকান বলা যায় না—সামান্য একটু জায়গা। কাঠের বাক্সের ওপর গোকুল নানা ওজনের মুর্গী সাজিয়ে রাখে। ছুরি দু'তিনটে থাকে বটে তার হাতের কাছে, কিন্তু বেশী ব্যবহার করতে হয় না। লণ্ডনের লোক গোটা মুর্গী বাড়ী নিয়ে যেতে ভালবাসে। রোষ্টের ব্যাপার কি না। সে আবার আর এক সমস্যা। কারি খেতে হলে মুর্গী কেনবার সময় দোকানীকে জানিয়ে দিতে হয়, তা না হলে দেবে রোষ্ট চিকেন—তাহলেই হয়ে গেল। মানে সেদ্ধ

হতে তিনচার ঘণ্টার ধাক্কা। অবশ্য সেদ্ধ করে খাবার মুর্গী বেশী রাখে গোকুল। বাড়ীতে কারি আর ক'টা লোক বানায় লণ্ডন শহরে। সবাই বলে, রোষ্টিং চিকেন। মাঝে মাঝে ভারতীয়রা অন্য মুর্গী চায়। না চাইলেও ক্ষতি নেই, গোকুল জানে কাকে কি দিতে হবে।

ব্যবসা কিন্তু গোকুলের নয়। পেটিকোট লেন বাজারে বসবার জন্যে সে শুধু কমিশন পায়। মালিক হল আর এক বাঙালী। নাম মিহির ঘোষাল। ভদ্রলোকের ছেলে নাকি পড়াশুনো করতে এসেছিলো। ব্যবসায়ে হাত পাকিয়ে মেম বিয়ে করে লণ্ডনে জাঁকিয়ে বসেছে। বাড়ীতে দামী দামী আসবাব, নিজের মোটর গাড়ী, কুকুর, টেলিভিশন। ছোটো-খাটো জায়গায় যেখানে তার মতো ভদ্রলোক যেতে পারে না সেখানে তার কাছ থেকে কমিশন পাবার আশা পেয়ে যায় গোকুলের মত ছোটলোক—আগে যে ছিল জাহাজের অশি-ক্ষিত খালাসী। রবিবার খুব সকালে থলি ভরে মুর্গী নিয়ে গোকুল টিউব ধরে। অনেকটা পথ আসতে বেশ সময় লাগে তার। চিকেন –নাইস্ চিকেন ফ্রেশ চিকেন! হেই মিষ্টার, হিয়ার—হিয়ার—মোটা মুর্গী হাতে তুলে সকাল থেকে দুপুর অবধি গোকুল গলা ফাটায়।

ইউ ইণ্ডিয়ান, পাশের ইংরেজ মুর্গীওলা জনি চোখ বাঙায় গোকুলকে, কি গলা তোমার! অমন চেঁচালে আমাদের গলা কার কানে যাবে বল?

শাটআপ, গোকুল তার দিকে তাকিয়ে বলে, তা তোমার লাভ হবে বলে কি আমি গলাবাজি বন্ধ করে নিজের ক্ষতি করবো।

এই লোকটার সঙ্গে গোকুলের ঝগড়া হবেই। কেউ ছেড়ে কথা বলবে না। অনেক সময় তারা এমন কাণ্ড করে যে, খদ্দের তাদের তুজনকে এড়িয়ে অন্যত্র মুর্গী কিনতে যায়।

কালো রঙ অর্থাৎ ভারতীয় ব'লে গোকুলের বেশ অসুবিধা হয় বৈকি। ইংরেজ খদ্দের প্রথমে দেশের লোকের কাছেই আসে। সেখানে সুবিধা না হলে কিংবা মনের মত জিনিষ না পাওয়া গেলে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে এসে দাঁড়ায় গোকুলের দোকানে। কেউ কেউ মুর্গি না কিনেই ফিরে যায়। বিদেশীকে সাহায্য করতে বিশেষ ইচ্ছে থাকে না ইংরেজের। কিন্তু সেজন্য গোকুল বিদেশী খদ্দেরকে মোটেই দোষ দেয় না। দেশের লোকই বা কি করেছে তার জন্যে, অবশ্য ভারতীয় খদ্দেররা প্রথমে গোকুলের কাছে আসে বটে কিন্তু দরাদরি করতে তাদের জুরি মেলা ভার।

এই তো সেদিন এসেছিল এক বাঙালী স্বামী-স্ত্রী। স্বামী ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলো কত দাম?

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে গোকুল উত্তর দিল, সাত শিলিং।

দূর, ঠিক করে বল!

স্ত্রী আস্তে আস্তে স্বামীকে বাংলায় বললো, এত সস্তায় অত বড় মুর্গী আর কোথাও পাবে না, নিয়ে নাও।

বেশ কঠিন স্বরে স্বামী বললো, আঃ থাম না তুমি !
সাধারণত গোকুল এসব প্রশ্ন আজকাল আর কাউকে করে না। তবু আজ কি জানি তার কি মনে হল, হঠাৎ বাংলায় জিজ্ঞেস করলো সেই বাঙালী ভদ্রলোককে, আপনারা বুঝি ইংল্যাণ্ডে বেড়াতে এসেছেন ?
পেটিকোট লেন বাজারের মুর্গীওয়ালার মুখে পরিষ্কার বাংলা কথা শুনে স্বামী-স্ত্রী বেশ অবাক হয়ে গেল !
খুব খুশি হয়ে স্ত্রী উত্তর দিল, হাঁা হ্যাঁ, তুমি বুঝি বাংলা দেশের লোক ?
গোকুল বললো, হ্যাঁ।
ক'বছর ব্যবসা করছ এদেশে -
গোকুল হেসে বললো, বাইশ বছর।
ও বাবা !
স্বামীর খুব বেশী উৎসাহ ছিল না গোকুলের জীবনের ইতিহাস শোনবার। পাছে কথায় কথা বাড়ে তাই সে তাড়াতাড়ি বললো, যাক গে, তবে তো ভালই হল, দেশের লোক যখন একটু কম করে দাম বল ?
বেশ, পাঁচ শিলিংএ নিয়ে নিন।
স্বামীর হয়তো আরও দর করবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু স্ত্রীর তার হাত ধরে বাধা দিয়ে বললো, আঃ নিয়ে নাও।
আচ্ছা দাও, পকেট থেকে পয়সা বের করতে করতে স্বামী বললো একটু বেশী নিলে কিন্তু—

এবার গোকুল দেশের লোককে একটু খোঁচা মেরে বললো, পোর্টিকোট লেন বাজার হলেও এটা লণ্ডন শহর—জিনিষ-পত্রের দাম একটু বেশী এদেশে।

কারণে অকারণে গায়ে পড়ে ঝগড়া করে জনি, কি লাভ হয় তোমার এখানে বসে সময় নষ্ট করে ?

তোমার কি দরকার তা দিয়ে ?

তোমার ভালর জন্যেই বলছি, এদেশের লোক তোমার কাছ থেকে মুর্গী কিনতে চায় না।

তারা বোকা তাই তোমার পচা মাল কেনে।

ইউ ব্লাডি. জনি চেঁচিয়ে ওঠে, কি বললে ? আমার মুর্গী খারাপ ?

খুব জোরে দাঁতে পাইপ চেপে গোকুল বলে, একশোবার খারাপ—আমার মুর্গী তোমার চেয়ে অনেক তাজা—

তা ওগুলো নিয়ে ইণ্ডিয়ায় গিয়ে ব্যবসা করনা ব্ল্যাকি—

আমার যা খুশী আমি তাই করবো বুঝলে শাদা বাঁদর ?

খবরদার গাল দিও না বলছি !

তুমি আগে মুখ বন্ধ কর ব্লাডি !

আচ্ছা দেখি আমার খদ্দের-ভাঙিয়ে তুমি এখানে কেমন করে ব্যবসা কর, জনি চোখ পাকিয়ে গোকুলের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, এটা ইংল্যাণ্ড।

ড্যাম্ ইউর ইংল্যাণ্ড। আমার পাশে বসে নিজের দেশের

লোকের কাছে বেশী দামে পচা মাল চালাতে লজ্জা করে না তোমার ?
আমিও দেখবো তোমাকে—
শাট্ আপ্ !
ইউ শাট্ আপ্ !
ব্ল্যাক বাস্টার্ড !
রেচেড্ লেপার্ !
তারপর পাল্লা দিয়ে চেঁচায় দু'জনে চিকেন-চিকেন ফ্রেশ চিকেন - নাইস-চিকেন্ ! হেই মিষ্টার —হিয়ার হিয়ার। আর তাই শুনে মনে হয় পেটিকোট লেন হাটে শুধু মুর্গী ছাড়া যেন আর কিছু কেনবার নেই।

আজ ভাল করে হাট বসল না। শীতকাল। থেকে থেকে ঝির ঝির করে বরফ পড়ছে ; জানুয়ারী মাস। হাওয়ার জোড় বড় বেশী। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া গোকুলের ফাটা ওভারকোট ভেদ করে দেহের হাড় কাঁপায়। শীতকালে বড় অসুবিধা হয় পেটিকোট লেন বাজারের ব্যবসায়ীদের। কখন বরফের ঝড় সব ওলটপালট করে দেয় ঠিক নেই।
ভাঙা হাটে কোলাহল জেগেছে। আর খদ্দেরের আশা নেই। যে যার জিনিষপত্র গুছিয়ে তল্পী তোলবার জন্যে ব্যস্ত। চারপাশে চেঁচামেচি ঠেলাঠেলি হতাশা আর বিশৃঙ্খলা।
আকাশের দিকে তাকিয়ে গোকুল একবার হাই তুললো.

মুর্গীগুলো দুটো কাগজের ব্যাগে ভরে, ছুরি. ওজন করবার জিনিশ, আর দোকানের এটা-ওটা সেই কাঠের বাক্সের মধ্যে রেখে তালা লাগিয়ে দিল। যদি দিন ভাল থাকে তাহলে আবার খুলবে আগামী রবিবার। সারা শীতটা এমনি করেই কাটে। অথচ সংসারের খরচ বাড়ে এ সময়। গ্যাস, গরম কাপড় সংসারের আরও টুকিটাকি এত খরচ তার হিসাব রাখা কঠিন।

কিন্তু আজ সবচেয়ে বেশীদুঃখ হয় গোকুলের একটিও মুর্গী বিক্রী হয়নি—প্রায় শূন্য পকেট। অথচ আজ তার বড় টাকার দরকার। গোকুলের স্ত্রী পেগী হাসপাতালে। একটা বেশ ভারী ছেলে হয়েছে তার কাল। পেগীর একটা কোটের দরকার। গোকুল কথা দিয়েছিল যেমন করে পারে আজ কোট কিনে নিয়ে যাবে। শরীরের অবস্থা ভাল নয় পেগীর। কতদিন হাসপাতালে থাকতে হবে বলা যায় না।

এই সময় পেগীর ছেলে হল। গোকুল নিজের ওপর রেগে যায় মনে মনে। কি দরকার ছিল এই দুঃসময়ে আরও খরচ বাড়াবার। পেগী ভাল থাকলে এত অভাব হত না তার সংসারে। এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরে বাসন মেজে আর ঘর ঝাঁট দিয়ে দু'পয়সা আয় করে সংসারের অনেক সুবিধা করে দেয় পেগী। এখন তা'ও বন্ধ।

শূন্য দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে গোকুল জুতোর তলায় ঠক ঠক করে পাইপ ঠুকতে লাগল। বড় আশা করে এদেশে

থেকে গিয়েছিল সে, ভেবেছিল সুখে খেয়েদেয়ে থাকবে—এদেশে নাকি কেউ উপোস করে না। দেশে সে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। জাহাজের খালাসী হয়ে প্রথম তার চোখ খুলে গেল। ভেবেছিল, এবার জাহাজে করে সে অনেক দূরদেশে গিয়ে নোঙর ফেলবে, যেখানে পেটে ক্ষিধে নিয়ে চোখের জল ফেলতে হয় না। তাই জাহাজ থেকে পালিয়ে পেগীকে খুঁজে বের করে সে লণ্ডনে ঘর বাঁধল।

কিন্তু আজ হাড়ে হাড়ে গোকুল বুঝেছে তার মত লোক যেখানেই থাক না কেন কোন সুবিধা হবে না। সর্বত্র এক অবস্থা। মাঝে মাঝে ভাবনা-চিন্তায় দম বন্ধ হয়ে যায় গোকুলের। তবু কোন রকমে চোখের জল চেপে সে ভাবে, এবার কোন্ দেশে যাবে সে? পৃথিবীতে কি এমন দেশ কোথাও নেই যেখানে তার মত লোক শান্তিতে থাকতে পারে? অন্ততঃ দারুণ শীতে যেখানে স্ত্রীর সব চেয়ে দরকারী কোট কেনবার জন্যে ভাবনায় দিশাহারা হতে হয় না।

হঠাৎ সব রাগ গিয়ে পড়ে গোকুলের মিহির ঘোষালের ওপর। আচ্ছা লোক বটে মিহির ঘোষাল। যদি নিজে ব্যবসা চালাবার মত মূলধন গোকুলের থাকত তা হলে হয়তো এত অসুবিধা হত না তার। কিন্তু সে অসম্ভব। অনেক চেষ্টা করেছে সে—পারেনি। মিহির ঘোষালের হাত থেকে বেরুবার কোন উপায় নেই গোকুলের।

মুর্গী বিক্রী না হলে একটি পয়সাও পায় না গোকুল। শুধু

যাবার-আসবার টিউবের ভাড়া দেয় মিহির ঘোষাল। একদিন গোকুল বলেছিল, আমি তো চেষ্টা করি ঘোষাল সাহেব, কিন্তু বিক্রী না হলে কি করব বলুন? আমাকে অন্তত সামান্য মাইনের ব্যবস্থা করে দিন।

গম্ভীর হয়ে মিহির ঘোষাল উত্তর দিয়েছিল, তা হয় না। আমার দিকটাও দেখতে হবে তো—বিক্রী না হলে মুর্গীগুলো নষ্ট হয় না? শুধু শুধু মাইনে দিয়ে লোক রাখব কেমন করে?

মিথ্যা কথা বলেছিল ঘোষাল। এদেশে আবার মুর্গী নষ্ট হয় নাকি! ফ্রিজিডিয়ারে থাকে তু'তিন মাস। মুর্গী তাজা কিনা সে কথা নিয়ে কোন খদ্দের মাথা ঘামায় না। এখানে কাটা মুর্গী কেনাই নিয়ম। জ্যান্ত মুর্গী কোথাও চোখে পড়ে না।

গোকুল কিন্তু কিছু বলেনি। মিহির ঘোষালকে চটালে তারই ক্ষতি। সপ্তাহের বাকি দিনগুলি তাকে তারই জিনিষ নিয়ে বিক্রী করবার চেষ্টা করতে হয়—নকল মণি-মুক্তো, দিশি কার্পেট ইত্যাদি।

তুত্তোর, গোকুল তুটো বড় বড় কাগজের ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে এগিয়ে গেল টিউব ষ্টেশনের দিকে। মুর্গীগুলো ফেরৎ দিয়ে মিহির ঘোষালকে হিসেব দিতে হবে।

বিকেল চারটের সময় ভারী মন নিয়ে গোকুল পেগী আর

ছেলেকে দেখতে ইষ্টএণ্ডের হাসপাতালের সামনে এসে দাঁড়ালো। গরীব পাড়ার হাসপাতালে শুধু গরীবের ভীড়। আজ রবিবার বলে অন্যান্য দিনের চেয়ে লোক অনেক বেশী হয়েছে।

চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেছে এর মধ্যে। এখনও ঝির ঝির করে বরফ পড়ছে! গোকুল দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে মাথা নিচু ক'রে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। উপায় নেই। কোন পয়সা পায়নি সে আজ। রাত্তিরে নিজে কি খাবে জানে না। পেগীর কোট কেনা দূরের কথা, সামান্য ছোটখাট জিনিযও আনতে পারেনি আজ তার জন্যে। গোকুলের বুক চিরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল।

হ্যালো পেগী, কেমন আছ?

ডাক্তার বলেছে আর ভয় নেই, শীগ্‌গিরই বাড়ী যাব। ফুটফুটে তাজা ছেলের দিকে তাকিয়ে গোকুল যেন তোতাপাখীর মত বললো, হ্যালো হ্যালো—

ওপাশ থেকে নতুন ছেলের কান্না ভেসে আসছে। এপাশে শুয়ে আছে একটা কুচকুচে কালো ছেলে। বাপ নিগ্রো, মা ইংরেজ। আজ ওরা বেরিয়ে যাবে তাই তৈরী হচ্ছে।

পেগীর মুখে আরও কত গল্প শুনলো গোকুল। অনেকের সঙ্গে নাকি তার আলাপ হয়েছে। নানা দেশের লোক আছে এই হাসপাতালে। কারুর মা নিগ্রো, বাবা ক্যানাডার লোক, বাবা জার্মাণ মা আইরীশ কিংবা মা ইংরেজ বাবা

ইণ্ডিয়ান। পেগী জানালো এদের সকলের অবস্থা নাকি গোকুলদের চেয়েও খারাপ!

হাসপাতালে বেশ গোলমাল হচ্ছে। ছেলের কান্না, বাপের উল্লাস মায়ের হাসি। গোকুল পেগীর কাছে বসে বসেই দেখতে পেলো, একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে অনেকে। কোলে নতুন ছেলে কিংবা মেয়ে। কি জানি কেন তাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গোকুলের মন সতেজ হয়ে উঠলো। এরা সকলেই তো গরীব। তোমার কোটের টাকা জোগাড় করতে পারিনি পেগী, গোকুল স্ত্রীর দুই হাত চেপে ধরলো।

হেসে পেগী বললো, মুর্গী বিক্রী হয়নি বুঝি? যাকগে আমার এখন কোটের দরকার নেই, দেখছ না হাসপাতাল থেকে দিয়েছে একটা!

পেগী নিশ্চিন্ত হলেও গোকুলের দুশ্চিন্তা দূর হ'ল না। কি করে দিন চলবে সে ভাবনায় মাথার ঠিক নেই তার। তবু ছেলেকে আদর করে যথাসময়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল সে। কোথায় ব্যথা লেগেছে গোকুলের। ছল ছল করছে দুই চোখ।

হাসপাতালের গেটের কাছে আসতে না আসতেই জনির সঙ্গে দেখা। সেই পেটিকোট লেন বাজারে যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী! গোকুল তাকে এড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু জনি কাছে এসে দাঁড়ালো তার। হ্যালো ইণ্ডিয়ান, গোকুলের

ছল ছল চোখ দেখে সমবেদনার স্বরে জনি জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কি ? কোন খারাপ খবর নেই তো ?

সকালের জনি বিকেলে যেন অন্য মানুষ। এমন করে সে যে কথা বলতে পারে গোকুল কল্পনাও করতে পারেনি। সে শুধু অবাক হয়ে জনির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কি হে, কথা বলবে না নাকি ? আরে এটা তো আর বাজার নয়—এটা হাসপাতাল—কি ব্যাপার বল ?

আমার স্ত্রী আছে এখানে—

তোমার স্ত্রীকেও এদেশে এনেছ বুঝি ?

সে ইংরেজ—এদেশের মেয়ে।

নাকি ? বাঃ বাঃ! তা কি হয়েছে তার ? ভাল আছে তো ?

হ্যাঁ, ছেলে হয়েছে তার।

আরে তাই নাকি ? জনি যেন লাফিয়ে উঠল, আমার স্ত্রীরও তো ছেলে হয়েছে আজ। তাকে দেখতে এসেছিলাম—এই হাসপাতালেই আছে, খুশিতে ঝলমল করছে জনির মুখ।

গোকুল জিজ্ঞেস করলো, ওরা দুজনেই ভাল আছে তো ?

হ্যাঁ হ্যাঁ ধন্যবাদ—খুব ভাল আছে। তা তোমাকে এমন গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন ? চল ওই 'পাবে' বিয়ার খাওয়া যাক একটু।

না না, আমাকে মাপ কর, আমার কাছে বেশী পয়সা নেই আজ।

আরে আমার কাছে আছে, এসো এসো—পাশাপাশি বসে মুর্গী বেচি—তু'জনেরই ছেলে হয়েছে—একসঙ্গে বসে একটু স্ফুর্তি করতে বাধা কি, অ্যাঁ? কাম অন্—গোকুলের হাত ধরে টেনে নিয়ে সামনের মদের দোকানে ঢুকলো জনি।

আসলে আজ এই গরীবের হাসপাতালে গোকুলকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে জনি। তাই তার এত উল্লাস। বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সে বললো, তোমাকে এ হাসপাতালে দেখে আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল তুমি বড়লোক।

গোকুল হেসে বললো, বড়লোক হলে পেটিকোট লেন বাজারে মুর্গী বেচতে বসব কেন?

ইণ্ডিয়ানরা তো সখ করে কত কি করে এদেশে। আর তা ছাড়া ফ্রিজিডেয়ারে রাখা অমন বড় বড় মুর্গী তোমার, তোমাকে পয়সাওয়ালা না ভেবে কি করি বল?

মুর্গী আমার নয়, সুযোগ পেয়ে গোকুল জনিকে জানালো মিহির ঘোষালের ব্যাপার।

অ্যাঁ বল কি! চোখ বড় করে জনি বললো, এমন করলে তোমার চলবে কেমন করে?

চলছে না, করুণ মুখে জনির দিকে তাকিয়ে গোকুল বললো, আর তো চালাতে পারছি না কিছুতেই।

বিয়ারের গ্লাস হাতে চেপে ধরে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো

জনি। তারপর আস্তে আস্তে গোকুলকে বললো, আমার সঙ্গে ব্যবসা করবে?

কেমন করে করবো? আমার তো টাকা নেই।

ড্যাম্ ইওর মানি, তুমি আর আমি মিলে খাটলেই টাকা হবে। বুঝলে ইণ্ডিয়ান—আমরা দু'জনেই গরীব—কাজেই কেউ কাউকে ঠকাতে পারবো না।

জনি গোকুলকে নিয়ে ঠিক কি করবে সে বুঝতে পারলো না। কিন্তু যেটুকু বুঝেছে সেটুকুই যথেষ্ট। বুঝেছে যে, এত সমবেদনা সে জনির কাছ থেকে শুধু গরীব বলেই পেল।

বিয়ারের গ্লাসে পর পর কয়েকটা চুমুক দিলো গোকুল। তারপর অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো জনির মুখের দিকে। তাকে আজ বড় আপনার মনে হচ্ছে গোকুলের।

কিন্তু গোকুল ভাবছিল অন্য কথা। সে ভাবছিল আজ হাসপাতালে দেখা পৃথিবীর অসংখ্য গরীব শিশুর মধ্যে তার নিজের সন্তানও একজন। ওরা একদিন বড় হবে। আজ যেমন করে জনি তার দুঃখ বুঝলো, অদূর ভবিষ্যতে দলে দলে তেমনি করে ওরাও ভাববে পরস্পরের সুখ-দুঃখের কথা।

আচ্ছা জনি, গোকুল হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, হাসপাতালের ওই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একদিন বড় হবে তো?

'হাঁ' করে গোকুলের দিকে তাকিয়ে জনি বললো, বিয়ারেই ব্রাণ্ডির নেশা হয় দেখছি।

২৭শে আগষ্ট : ১৯৫৩ : কলকাতা : সোমবার সকাল

শূন্য

ছোট্ট একটি মানুষ!

যার ভয়ে পড়াশুনো শেষ না ক'রে অসময়ে অসামকে একদিন বিলেত থেকে পালাতে হয়েছিলো, আজ দশ বছর পর আবার তারই টানে প্রচুর অর্থব্যয় করে তাকে লণ্ডনে ফিরে আসতে হলো। একেই বলে নিয়তির পরিহাস!

অসীম পালিয়ে এসে বাঁচলো আর তার বাঁচবার পথ সুগম করে দেবার জন্যে রোজমেরীকে বিয়ে করে তার বন্ধু নীরদ চিরকালের মতো লণ্ডনে থেকে গেল।

দশ বছর পর আর্লস্‌কোর্টে রোজমেরী আর নীরদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একে একে অসীমের অনেক কথা মনে পড়ে গেল। সে যখন অ্যাকাউন্টেন্সির ছাত্র হয়ে এখানে এসেছিলো তখনকার কথা।

অসীম বনেদি ঘরের ছেলে। সুন্দর তার চেহারা। উচ্চশিক্ষার জন্যে তাকে বিলেতে আসতে দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু তার মানে এ নয় যে তাদের সংসারে প্রগতির সামান্যও ইঙ্গিত আছে। অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী তার অভিভাবক। তাই রোজমেরীকে বিয়ে করবার কথা সে কল্পনা করতে

পারে নি। এমন কি, সমস্ত জানিয়ে রোজেমেরী যখন দৃঢ়স্বরে দাবী জানালো যে তাকে বিয়ে করতে হবে তখন সভয়ে তিন পা পিছিয়ে গিয়ে নিরুপায় হয়ে সে নীরদের শরণ নিলো। তার পক্ষে রোজেমেরীকে বিয়ে করা অসম্ভব। বাবা তা হলে তার মুখ দেখবেন না, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি থেকে সে বঞ্চিত ত' হবেই এবং তা হলে তার দেশে ফেরার কোন আশা থাকবে না। ইচ্ছে করে সর্বনাশ ডেকে আনতে কে চায়। অসীমও চাইলো না। ইংল্যাণ্ড থেকে রাতারাতি সে পলায়ন করলো।

একেবারে প্রথমে অবশ্য নীরদ রোজমেরীর সঙ্গে অসীমের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো। অসীমের কোনো দোষ ছিল না, তার বন্ধুর বান্ধবীর সঙ্গে বিশেষ রকম ঘনিষ্ঠতা করবার কথা তার পক্ষে ভাবা একেবারেই সম্ভব ছিলো না। কিন্তু কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল। না ডাকতেই রোজমেরী এগিয়ে এলো একেবারে অসীমের খুব কাছে। অসীম অবাক হলো, কি করবে ভেবে পেলো না। আর নীরদ? তার চেহারা ভালো নয়। শুধু অসীমের সঙ্গে কেন, এই পৃথিবীর কারো সঙ্গে কোনো মেয়েকে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। সে জানে এদেশের মেয়েদের মন জয় করতে হলে যে গুণগুলি থাকা দরকার তার একটিও নীরদের নেই। অর্থাৎ রূপ আর কথাবার্তার চটক। সে লাজুক নম্র বিনয়ী আর প্রবল তার অভিমান।

সুইট্জারল্যাণ্ডের সুন্দরী মেয়ে রোজমেরীর সঙ্গে আলাপ করে নীরদ খুশি হলো। আর নিজেকে ধন্য মনে করলো যখন রোজমেরী তাকে আবার তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বার বার অনুরোধ করলো। প্রায়ই তাদের দেখা হতে লাগলো। ত্ব'জনে একসঙ্গে এত বেশি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো যে লণ্ডনের বাঙালী সমাজ ধরে নিলো নীরদ আর একা ফিরবে না, রোজমেরীকেও সঙ্গে করে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবে। এ সব কথা নীরদের কানে আসে কিন্তু কখনও কোথাও সে প্রতিবাদ জানায় না, শুধু মাঝে মাঝে এইটুকু বলতে ইচ্ছে করে যে বিয়ে সে এক সময় রোজমেরীকে করবে বটে, কিন্তু হয়তো দেশে ফেরা তার আর হয়ে উঠবে না। সে ডাক্তারির ছাত্র, মামার পয়সায় মানুষ। তাঁরই পয়সায় বিলেতে এসেছে। কাজেই ভারতবর্ষে তার কোনো আকর্ষণ নেই। পাশ করে সে লণ্ডনে পসার জমাবার চেষ্টা করবে।

ঠিক অমনি সময় রোজমেরী আর অসীমের ভালো করে আলাপ হলো। রোজমেরী ওদের ত্ব'জনের তুলনা করে অবাক না হয়ে পারলো না। এক দেশের লোকের রঙের অত তফাৎ, কথাবার্তা বলবার ধরণ এত আলাদা হয় কেমন করে। তার অবশ্য মনে হলো না অসীমের সঙ্গে আগে আলাপ হয় নি কেন, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে সে অসীমের সঙ্গে পরিচয় গভীর করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

জানো নীরদ, রোজমেরী কি ভাবতে ভাবতে বললো, তোমার বন্ধুকে আমার খুব ভালো লেগেছে।

শুনে খুশি হলাম, ওকে সকলের ভালো লাগে।

আমি আবার ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই—

ফোন নম্বর তো নিয়েছো, ইচ্ছে হলে দেখা করবার বন্দোবস্ত নিজেই নিশ্চয় করে নিতে পারবে ?

রোজমেরী হেসে বললো, পারবো, তারপর একটু পরে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললো, তোমাদের ছু'জনের কী আশ্চর্য প্রভেদ।

করুণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে নীরদ বললো, আমি জানি রোজমেরী, অন্য সকলে আমার চেয়ে রূপে গুণে বিত্থায় বুদ্ধিতে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ—

যাকে এসব কথা বলা হলো সে কিন্তু উত্তর দিলো না। নিঃশব্দে পথ চলতে লাগলো। তখন কঠিন শীতের কুয়াশা-থমথম-করা সন্ধ্যা।

এর জন্যে ওদের তিন জনের মধ্যে কেউ প্রস্তুত ছিলো না। নীরদ কোনো প্রতিবাদ না জানিয়ে দূরে সরে গেল, তার অভিমান হলো কিনা সে কথাও বোঝা গেল না। আর রোজমেরী অসীমের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো। সুইট্জার-ল্যাণ্ডের মেয়ে রোজমেরী। তার বাবা দেশে সামান্য চাকরী করে। জীবিকা উপার্জন করতে তার লণ্ডনে আসা।

কিন্তু এখানে এসে জীবন সম্বন্ধে অকস্মাৎ কৌতূহল বেড়ে গেল। জ্ঞানের পরিধি যে এত বিরাট সে কথা তার জানা ছিলো না। নতুন দেশের অনেক নতুন লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হলো। সকলকেই ভালে লাগলো তার। কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগলো নীরদকে, তারপর অসীমকে দেখে রোজমেরীর মনে হলো তার আরও অনেক দেখা উচিত ছিলো। নীরদকে মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছে বলে আজ সর্বপ্রথম তার দুঃখ হলো।

তারপর সেই সন্ধ্যা। সেকথা ভাবলে আজও অসীমের সমস্ত শরীর হিম হয়ে যায়, নিদারুণ ভয়ে তার বুকের কাঁপন বেড়ে যায়। হ্যাঁ, সেই শান্ত নম্র বন্ধু নীরদ সেদিন তাকে বাঁচিয়েছিলো। দিশাহারা হয়ে অসীম ছুটে এসেছিলো তার কাছে।

নীরদ; আমাকে বাঁচাও—

কি হয়েছে অসীম?

সর্বনাশ হয়েছে, আমি কিছুতেই রোজমেরীকে বিয়ে করতে পারবো না।

তাতে এত ঘাবড়াবার কি আছে? তুমি কি রোজমেরীকে বিয়ে করবে কথা দিয়েছিলে?

কোনোদিনও না। তুমি জানো এখানে বিয়ে করলে আমার ভবিষ্যৎ কি হবে। আর ওকে আমি ভালোবাসি নি। সেকথাও ও জানে।

তাহলে তোমার ঘাবড়াবার কি আছে আমি তো বুঝতে পারছি না।

ঘাবড়াবার যথেষ্ট কারণ আছে। যদি অন্যায় কিছু বলি তুমি আমাকে মাপ করো কারণ আমার মাথার ঠিক নেই—

একটু অধৈর্য হয়ে নীরদ বললো, বল অসীম, কি হয়েছে ?

অসীম নীরদের একটা হাত ধরে ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমার স্বভাব আমি জানি, তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে, তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, আজও তুমি রোজমেরীকে ভালোবাসো ?

কি ভেবে অবাক হয়ে নীরদ জিজ্ঞেস করলো, এতদিন পর একথা তুমি জিজ্ঞেস করছো কেন অসীম ?

বল, বল, আমার দরকার আছে।

আস্তে নীরদ উত্তর দিলো, হ্যাঁ, ভালোবাসি।

তুমি ওকে সাতদিনের মধ্যে বিয়ে করতে পারবে ?

হ্যাঁ, তাও পারবো।

ঠিক আছে, নীরদের কথা শুনে অসীমের মুখ থেকে এবার চিন্তার রেখা দূর হলো। নিশ্চিন্ত হয়ে সে বললো, আমি বুঝতে পেরেছি যে রোজমেরী আজও তোমাকে ভালোবাসে। আমার ওপর ওর শুধু একটা মোহ জেগেছে। তার কোন মূল্য নেই। ওর মোহ আমি ভেঙে দিতে চাই—

না না, নীরদ বাধা দিয়ে বললো, তাকে কষ্ট দিও না।

কষ্ট দু'দিনের, আমি কাল প্লেনে দেশে ফিরে যাচ্ছি, অসীম

মিথ্যা কথা বললো, বাবার খুব অসুখ, আমাকে যেতেই হবে। আমি চলে যাবার পরই তুমি রোজমেরীর সঙ্গে দেখা করো। তারপর পুরানো আলাপ ঝালিয়ে ওকে বিয়ে করো। আমি বলছি নীরদ, ও তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হবেই—
কিন্তু একথা বলতে এসে তুমি অত বিচলিত হচ্ছিলে কেন? তোমার চেহারা দেখে আমি ভেবেছিলাম যে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে।
সাংঘাতিক কিছু ঘটলেও সেকথা নীরদেকে আর জানাবার দরকার নেই। অসীম ভাবেনি যে এত সহজে নীরদ রোজমেরীকে বিয়ে করতে রাজি হবে। তাই যে কথা স্বীকার করে সে নীরদের সাহায্য নিতে এসেছিলো সে-সাংঘাতিক কথা আর নীরদকে বলবার দরকার হলো না। তার মাথা এখন একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!
নীরদের দিকে তাকিয়ে অসীম বললো মানে, তোমাকে সত্যি কথা বলতে কি, তোমার কথা ভেবে অনুতাপে আমার বুক জ্বলে যাচ্ছিলো। রোজমেরীর সঙ্গে তোমার সম্পর্কের কথা তো আমি জানতাম। তাই আমার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা আমাকে পীড়া দিতো। আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু ফল হয় নি। তাই এবার ওর চোখের আড়ালে গিয়ে বোঝাতে চাই, তুমি ছাড়া ওর আর কেউ নেই; একটু ভেবে অসীম বললে, আমি চলে যাবার পর তুমি ওকে নিশ্চয়ই বিয়ে করবে নীরদ—

কিন্তু ও যদি রাজী না হয় ?

আমি বলছি ও রাজী হবেই।

পরদিন অসীম ভারতবর্ষের প্লেন ধরলো। ব্যস, আর ভাবনা নেই। একবার দেশে গিয়ে পৌছতে পারলে কোন ভয় নেই। এক মুহূর্তের দুর্বলতার বোঝা বইবার জন্যে সারা জীবন সে কিছুতেই নষ্ট করতে পারে না। আসবার আগে রোজমেরীর সঙ্গে দেখা করে আসা দরকার মনে করেনি অসীম। যা হয় করুক ও। অসীম ওকে কোনদিন বিয়ে করবার কথা বলেনি। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে তার জন্যে অসীমের চেয়ে রোজমেরীর দোষ বেশি। নিজেকে বাঁচাবার মতো বুদ্ধি তার নিশ্চয়ই আছে। নীরদের কাছে কিছু স্বীকার না করে যদি সে তাকে বিয়ে করে তাহলে তারই মঙ্গল— তা হলে সবদিক রক্ষা হয়। যাক, যা খুশি করুক ওরা। প্লেন ভারতবর্ষের দিকে উড়ে চলেছে। অসীমের আর কোন দায় নেই।

দেশে ফিরে আত্মীয়স্বজনকে অসীম কৈফিয়ৎ দিলো, ওদেশের জলহাওয়ায় তার শরীর ভেঙে পড়ছে, কাজেই সে আর পড়াশুনো করবার জন্যে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবে না। শরীরের দিকে আগে দৃষ্টি রাখতে হবে তো—স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল।

অসীমের কথা বিশ্বাস না করবার কোনো কারণ ছিলো না। সকলেই তার কথা মেনে নিলো। কলকাতায় অসীম

কিছুতেই চাকরী করতে চাইলো না, সে অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে চায়—যেখানে কেউ তাকে চেনে না, যেখানে তার অতীতের কথা জানবার সম্ভাবনা কারুর নেই। তাই তার বাবার অনেক বন্ধু-বান্ধবকে ধরে অ্যাকাউণ্টেন্সি পাশ না করেও মিলিটারি অ্যাকাউণ্টস্-এ চাকরী নিয়ে অসীম মীরাটে চলে এলো।

সেখানে এসে সে যেন শান্তির নিশ্বাস ফেললো। না, রোজমেরীর কথা কেউ জানতে পারবে না। কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করবে না। অসীম জীবনে আর কিছু চায় না। এমনি লুকিয়ে থেকে সে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে চায়। বিয়ে সে করতে পারবে না কোনদিন। বাড়ীর লোক অনেক চেষ্টা করেও তার বিয়ে দিতে পারে নি। বিয়ে করবার সাধ মিটে গেছে অসীমের।

পৃথিবীর খবর না রেখে লুকিয়ে থাকবার বাসনা প্রবল হলেও সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে মাত্র একটি খবর অসীম জানতে চায়। রোজমেরীর কি হলো? ছেলে না মেয়ে? নীরদের সঙ্গে শেষ অবধি তার বিয়ে হলো কিনা?

কার কাছ থেকে একথা জানবে অসীম? কেমন করে শুনবে? কেটে গেল অনেক অস্বস্তি-ভরা মীরাটের দিন। কিন্তু খবর সে পেলো একদিন। এক ছোকরা ডাক্তার সম্প্রতি বিলেত থেকে ফিরছে, মীরাটে বেড়াতে এসে একবেলা সে অসীমের বাড়িতে ছিলো। কথায় কথায় তার কাছ থেকে অসীম

শুনলো যে নীরদ ডাক্তারি পাশ করেছে আর সেখানে বিয়ে করে থেকে গেছে। এমন কি, এর মধ্যে ছোকরা ব্ল্যাক ডাক্তার বলে ওর বেশ নাম হয়ে গেছে।

উৎসুক হয়ে অসীম জিজ্ঞেস করলো, কার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে আপনি জানেন?

ইংরেজের সঙ্গে নয়, একটি সুইস্ মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছেন, হেসে ডাক্তার বললো।

অসীমের বুক অসীম উত্তেজনায় কাঁপছে। তবুও না জিজ্ঞেস করে পারলো না, আচ্ছা ছেলে মেয়ে হয়েছে নাকি ওদের?

ডাক্তার উত্তর দিলো, একটি মেয়ে। অবশ্য আমি তাকে দেখিনি। নীরদবাবুর স্ত্রী যখন হাসপাতালে ছিলেন তখন আমি দেশে ফিরে আসি। আমাদের এক বন্ধু ওর মেয়ের কথা বলেছিলো—

সেই ফুটফুটে ছোটো মেয়েটি অসীমের বুক ভরে রাখে—সারাদিন সারারাত। গভীর কাজের মধ্যে সে যখন ডুবে থাকে তখন এলোমেলো হাওয়ায় হঠাৎ সাত সমুদ্র পেরিয়ে এসে সেই মেয়েটি তাকে আজ ভুলিয়ে দেয়। রাত্তিরে যখন তার ঘুম কিছুতেই আসতে চায় না তখন মাথার কাছে দাঁড়িয়ে একটি ফুটফুটে ছোট্ট মানুষ অনর্গল আবোল তাবোল বকে যায়। শীতের কুয়াশা-কঠিন সকালে তার ভাবনা অসীমের কপালে জমিয়ে তোলে বিন্দু বিন্দু ঘাম। দিনে দিনে সে

বড়ো হচ্ছে, মাসে মাসে সে রূপ বদলাচ্ছে, বছরে বছরে সে বলতে শিখছে কত কথা। কি নাম ওর? তাকে কবে দেখবে অসীম? সে তার সঙ্গে কথা বলে, খেলা করে, নানা আব্দার ধরে, কাছে কাছে থাকে সারাক্ষণ কিন্তু অসীম যে তাকে স্পর্শ করতে পারে না কিছুতেই। এ কী পরিহাস? তাকে বুকে সেঁটে নেবার জন্যে অসীমের দুই বাহু যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু তার আর অসীমের মাঝখানে ভয় লজ্জা আর সাত সমুদ্রের ব্যবধান। সে তার নিজের মেয়েকে দেখতে পায় কিন্তু স্পর্শ করতে পারে না।

তবু, ও একা যেন ভরে রাখে অসীমের নিঃসঙ্গ সংসার। সে তার সঙ্গে খেলা করে, খাইয়ে দেয়, ঘুম পাড়ায়, সকালে বিকেলে নিয়ম করে বেড়াতে নিয়ে যায়। আর বার বার মনে মনে বলে, আমার একমাত্র মেয়ে, এর নাম শীলা। ফর্সা রঙ, কোঁকড়া চুল, ফুটফুটে চঞ্চল দুরন্ত ছোটো মেয়ে: কথা শোনে না, বারণ মানে না, গ্রাহ্য করে না বাবাকে।

শীলা, আপিস থেকে ফিরে চকলেটের ছোটো শ্ল্যাব বের করে সোফার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে অসীম বলে, তোমার চকলেট, লক্ষ্মী হয়ে থাকলে আরও অনেক জিনিস দেবো— হাওয়ায় জানলার সার্সি নড়ে ওঠে, দূরে কোথায় পাতা ঝরে যায় আর সাত সমুদ্রের ঢেউ বুকে এসে লাগে একের পর এক। কার খুশির হাসি ভেসে আসে যেন। চকলেট শুকিয়ে যায়, পিঁপড়েয় খায়, মেথর নিয়ে যায়।

আপিসে বেরোবার আগে অসীম বলে যায়, সারা দুপুর ঘুমোবে, দিবাকর দুধ খাওয়াতে এলে কথা শুনবে, তোমার জন্যে অনেক জামা নিয়ে আসবো আজ—

কে যেন পেছনে পেছনে আসে। কার পায়ের শব্দে যেন মুখর হয়ে ওঠে ওর ঘর। দেয়ালে দেয়ালে কচি গলার স্বর বাজে।

না না না, রোদ্দুরে অমন করে ছুটোছুটি করে না শীলা, অসুখ করবে। শিগগির ঘরে এসো। আঃ, বড়ো বিরক্ত করিস আমায়। কাঁহাতক তোর দিকে নজর রাখবো! আমার কাজকর্ম নেই নাকি? না না না, এখন আমি বেড়াতে যেতে পারবো না, শিগগির ভেতরে আয়—

তুমি আমার দিকে বলটা ছুঁড়ে দাও! দূর বোকা, আরও অনেক জোরে ছুঁড়তে হয়।...আচ্ছা এইবার তুমি ধরো।... এই রে, লাগলো নাকি শীলা? হ্যাঁ লেগেছে—

খাবার সময় অত বকতে হয় না। চুপচাপ খেয়ে নাও। তোমাকে খাওয়াতে কি আমি পারি? কবে যে বড়ো হবে, কবে যে নিজে খেতে পারবে ভালো করে—

—না আজ টঙ্গা চড়া হবে না। চলো হেঁটে বেড়িয়ে আসি —অনেক দূরে। চলো এই রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে যাই। সে কি? এর মধ্যেই পা ব্যথা হয়ে গেল? ভারী দুষ্টু মেয়ে তো! কোলে চড়তে পেলে আর কিছু চাওনা, না? এসো কোলে—

এবারে ঘুমোও। আর কত গল্প বলবো! হ্যাঁ হ্যাঁ, রাজকন্যা ম'রে গেল। তারপর রাজপুত্র সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ওকে আবার বাঁচিয়ে দিলো। অনেক রাত হয়ে গেছে শীলা, দেখছো না আমার হাই উঠছে। আমিও তোমার পাশে শুয়ে পড়ি,—মেয়েকে যেন বুকে নিয়ে অসীম এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

আর কিছু চায় না অসীম। আর কাউকে তার দরকার নেই। একটি ছোট্ট মেয়ে অসীমের সংসার মাতিয়ে রাখে। কে জানতো তার মনের নিভৃতে এত স্নেহ লুকিয়ে আছে—এত মায়া! সে তো এমন ক'রে নিজেকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখে নি কোনদিন। একটা ছোট্ট মানুষের ভাবনা তাকে সারাদিন এমন করে আচ্ছন্ন করে রাখে কেন! তার জন্যেই যেন অসীমের সমস্ত কিছু। আর কোনো কামনা তার নেই। শীলাকে নিয়ে এমনি করেই অসীম কাটিয়ে দেবে জীবনের বাকী দিনগুলি। ভরা প্রাণে বছর ঘুরে যায়। দশ বছর কাটলো।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষি কমে এলো অসীমের। চোখের সামনে তার নিজের মেয়েকে দেখবার জন্যে সে ব্যাকুল হলো। দূর থেকে আজও খবর নিতে পারে না, সঙ্কোচ হয়, ভয় লাগে, রাজ্যের লজ্জা এসে যেন তার সারা শরীরে ঘিরে ধরে। যারা বিলেত থেকে আসে তাদের এই কারণে এড়িয়ে চলে অসীম। নিজের মেয়ের খবর অন্য কারোর মুখ থেকে অমন

করে সে চায় না। নিজের রক্ত দিয়ে গড়া মেয়েকে অসীম প্রাণপণ শক্তিতে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরতে চায়। তাকে না দেখতে পেলে সে পাগল হয়ে যাবে। কে ভেবেছিলো সেই মেয়ে তাকে এমনি দিশাহারা করে দেবে, সব ভুলিয়ে আবার তাকে উৎসাহিত করে তুলবে সমুদ্রলঙ্ঘনে! তার সব কিছু ছাড়িয়ে উঠবে সে মেয়ে!

রোজমেরীকে ছেড়ে চোরের মতো পালিয়ে আসবার সময় তার একবারও মনে হয় নি যে পিছন তাকে আবার এমন করে টানবে—তুচ্ছ হয়ে যাবে লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়। যার হাত এড়াবার জন্যে পালিয়ে ছিলো তার ছোট্ট হাত নিরন্তর তাকে এমনি পিছু ডাকবে।

এমন হবে জানলে অসীম কিছুতেই তেমন করে চলে আসতে পারতো না। সব ভুলে সে রোজমেরীকে পৃথিবীর সামনে স্বীকার করে নিতো। বাবার সম্পত্তির মূল্য কানাকড়িও হতো না তার কছে। সেই সম্পত্তির লোভ করতে গিয়ে আজ সে যেন নিদারুণভাবে বঞ্চিত হয়েছে মহাসম্পদ্ থেকে। একি করলো সে! দেশে ফিরবার দিন থেকে আজ অবধি এক মুহূর্তের জন্য সে তার নিজের মেয়েকে ভুলতে পারে না। এতদিন নিরুপায় হয়ে কোনো রকম ধৈর্য ধরে ছিলো কিন্তু তার সে পারবে না। তাকে মেয়ের কাছে ফিরে যেতেই হবে। না হলে সে পাগল হয়ে যাবে। তাকে প্রাণভরে দেখবে, অনেকক্ষণ ধরে কথা শুনবে, উজাড় করে দেবে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ।

টাকার অভাব নেই অসীমের। আর কে-ই বা আছে তার জীবনে। মেয়েকে দেখা ছাড়া তার আর কাজ নেই। প্রায়ই তাকে দেখতে যাবে অসীম। সুবিধা হলে মাঝে মাঝে নিজের কাছে এনে রাখবে।

ছোট্ট একটি মেয়ে! তাকে অসীমের চাই-ই- চাই!

লণ্ডনে ভারতীয় মহলে নীরদ ডাক্তারের বেশ নাম আছে। কিন্তু ওদের সম্বন্ধে কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করলো না অসীম। লণ্ডনে যেদিন পৌঁছলো সেদিন সন্ধ্যেবেলা টেলিফোন ডিরেক্টারী থেকে নম্বর নিয়ে সটান নীরদাকে ফোন করলো।

হ্যালো? আশ্চর্য, রোজমেরীর গলা ঠিক তেমনি আছে।

রোজমেরী?

হ্যাঁ। কে কথা বলছে?

আমি —আমি– অসীম থেমে গেল।

কে?

আমি অসীম---

কে?

অসীম--নীরদের বন্ধু।

সহসা চিনতে পেরে উল্লাসে চীৎকার করে রোজমেরী বললো, হ্যালো, অসীম! কোথা থেকে কথা বলছো তুমি?

লণ্ডন থেকে—

কবে এলে ? কেমন আছো ? কতদিন থাকবে ? বল বল— টেলিফোনে রোজমেরী যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

তার কথা শুনে অসীমের জড়তা কেটে গেল। সে সহজ স্বরে উত্তর দিলো, আজ এসেছি, মাসখানেক থাকবো। তুমি কেমন আছো রোজমেরী ?

খুব ভালো। ধন্যবাদ। তুমি ?

ভালো —নীরদ ?

সেও খুব ভালো আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় নীরদ এখন লণ্ডনে নেই. আমেরিকায় রিসার্চ করতে গেছে। কাজেই তার সঙ্গে তোমার বোধ হয় দেখা হবে না অসীম।

তোমার সঙ্গে দেখা হবে কবে ?

যে কোনো মুহূর্তে, হেসে রোজমেরী বললো, তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি সব সময় প্রস্তুত।

কাল যাবো ?

নিশ্চয়ই, কাল আমার এখানে এসে চা খেও।

অনেক ধন্যবাদ, এর পর আর কিছু বলবার নেই। এখুনি রিসিভার নামিয়ে রাখতে হবে তাই একটু থেমে অসীম বললো আচ্ছা রোজমেরী—

কি বল ?

তোমার মেয়ে—অসীমের সুর কাঁপলো, ছেলেমেয়ে কেমন আছে ?

খুব জোরে হেসে রোজমেরী বললো, তুমি এসো না আগে, তারপর ওসব খবর নিও।
অমন করে হাসলে কেন রোজমেরী!

চেহারা ঠিক তেমনি আছে। বয়সও যেন বাড়েনি। রোজমেরী মুখের দিকে দৃষ্টি থাকলেও অসীমের কান কচি গলার স্বর শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলো। এখুনি সে ছুটে আসবে, অপরিচিত অসীমকে দেখে থমকে দাঁড়াবে এক মিনিট, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তার কোলে। তখন কি করবে অসীম? কেমন করে তাকে আদর করবে?
সেই যে তুমি চলে গেলে, অসীমের কাপে চা ঢালতে ঢালতে রোজমেরী বললো, তারপর কোনো খবরই দিলে না। এই সেদিন অবধি তোমার কথা আমরা বলাবলি করতাম—
বাধা দিয়ে অসীম বললো, বাবার অসুখ করেছিল। হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে আমি চলে যাই আর দেশে গিয়ে এমন অসুবিধায় পড়েছিলাম—
থাক থাক, আমি সব জানি। প্রথম থেকেই সব জানতাম, তবু তোমার উপর কী আকর্ষণেই যে দিশা হারিয়েছিলাম—
নীরদ কবে ফিরবে রোজমেরী?
আরও মাস ছয়েক পর, কয়েক মুহূর্তের জন্যে থামলো রোজমেরী। চোখ বন্ধ করে কী যেন ভেবে আবার বললো,

ওর মতো উদার স্বামী হয় না, তোমার সঙ্গে মিশে ওকে দুঃখ দিয়ে আমি কী ভুল করেছিলাম!

চাপা অস্বস্তিতে অসীমের বুক ভরে উঠছিলো। এখানে আর এক মুহূর্তের জন্যেও বসে থাকতে ভালো লাগছে না। এখনি হয়তো আরও নানা কথা উঠবে—যা শোনবার ক্ষীণতম ইচ্ছেও তার নেই। অধীর আগ্রহে সে শুধু তার মেয়ের প্রতীক্ষা করছে; তাকে দেখবার জন্যেই ছুটে আসা! কিন্তু কোথায় সে? বিকেলে বেড়াতে যায় নাকি? তার একটা ছবিও কি তুলে রাখে নি এরা? দেয়ালের দিকে বৃথাই দৃষ্টি বুলোলো অসীম। কিছু নেই কোথাও।

রোজমেরী হঠাৎ প্রশ্ন করলো, কী ভাবছো অসীম?

কথা বলতে গিয়ে অসীমের বুক কেঁপে উঠলো। প্রশ্ন শুনে কী ভাববে রোজমেরী! তবু সে জিজ্ঞেস করলো, কই তোমার ছেলেমেয়েদের তো দেখছি না, ওরা কী সব নীরদের সঙ্গে আমেরিকা গেছে নাকি?

খিলখিল করে হেসে রোজমেরী বললো, ছেলেমেয়ের মুখ আর দেখতে পেলাম কই, তোমার বন্ধুরও এত সখ—স্তিমিত দৃষ্টিতে অসীমের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললো, ডাক্তার বলে আমার নাকি ছেলেমেয়ে হবেই না। তাই নীরদ মাঝে মাঝে আমাকে ঠাট্টা করে বলে, "বন্ধ্যা মেয়েমানুষ।"

আর কিছু অসীমের মনে নেই। আর কিছু সে শোনে নি। তারপর সে যতক্ষণ সেখানে ছিলো রোজমেরীর আর একটি কথাও তার কানে যায় নি। কোনোদিকে না তাকিয়ে এক সময় কোনোরকমে বিদায় নিয়ে যন্ত্র-চালিতের মতো সে বাইরে বেরিয়ে এলো।

তাহলে কী মিথ্যা কথা বলে তখন রোজমেরী তার সাহসের পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলো? না ভুল করেছিলো? কিংবা মজা দেখবার জন্যে তার সঙ্গে রসিকতা করেছিলো? এত বড়ো ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করবার কী অধিকার ছিলো তার। এখন কার কাছে যাবে অসীম? কেমন করে দেশে ফিরবে।

অনেক তুষার ঝরেছে। এলোমেলো কঠিন হাওয়ায় ভেসে আসছে ঝরা তুষারের বিষণ্ণ গান। একটি একটি করে অসীমের বুকের পাঁজর যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে। একমাত্র মেয়ের মৃত্যুর শোকের সঙ্গে প্রকৃতির এমন আশ্চর্য সামঞ্জস্য আর কোনোদিনও বোধ হয় কোথাও দেখা যায় নি।

৮ই সেপ্টেম্বর : ১৯৫৪ : কলিকাতা, বুধবার সকাল